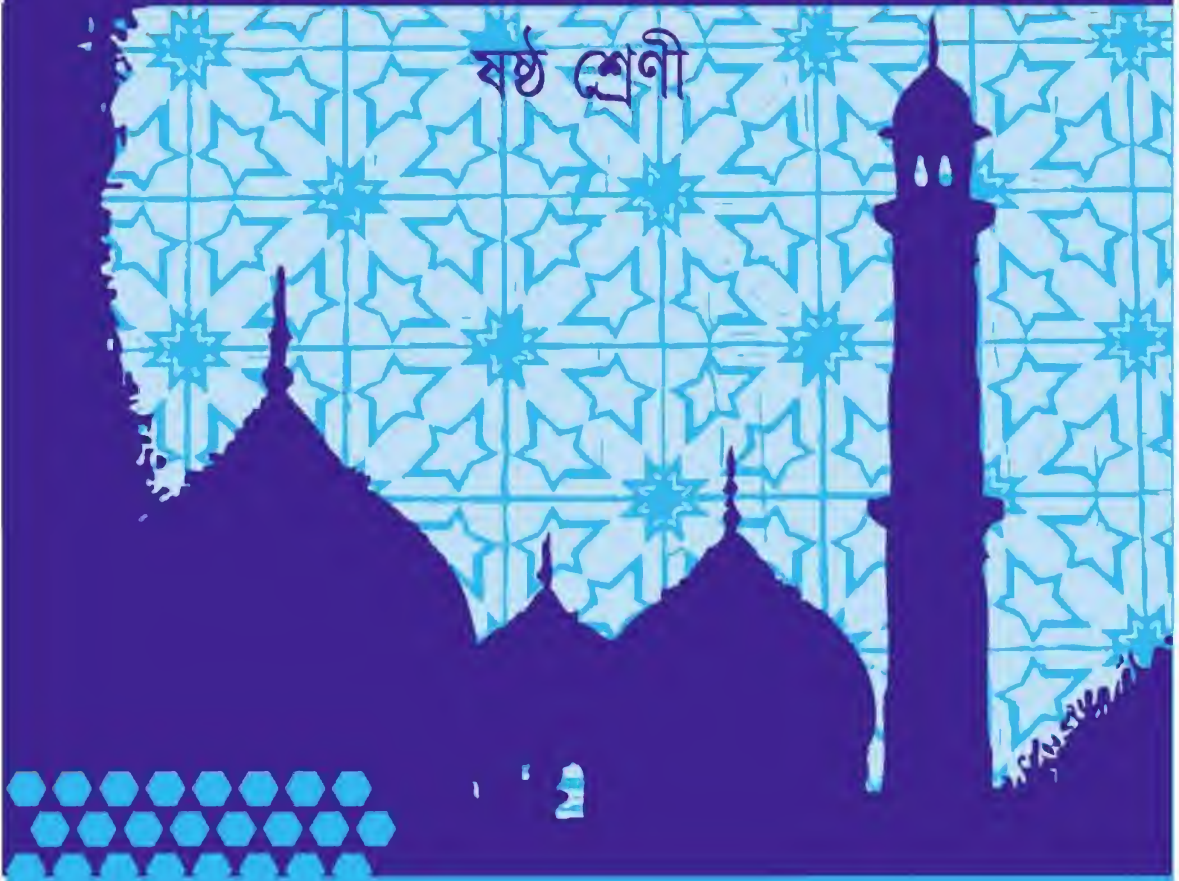


ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম-শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী

সংকলন ও রচনায়

এ বি এম আব্দুল মান্নান মিয়া

ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

হাফেয মুহাম্মদ লুৎফর রহমান

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ আবদুস সালাম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮

পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ

ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ

সেলিম আহমেদ

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণ :

সূচিপত্র

| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা |
|---|--------------|---|--------------|
| প্রথম অধ্যায় : আকাইদ | ১-৯ | মুনাজাতমূলক তিনটি আয়াত | ৩৪ |
| তাওহীদ | ১ | হাদীস শরীফ | ৩৫ |
| কালিমা তায়্যিবা, কালিমা শাহাদাত | ২ | চতুর্থ অধ্যায় : আখলাক | ৩৯-৫১ |
| ঈমান মুজমাল | ৩ | আখলাকে হামীদাহ্ | ৩৯ |
| আস্‌মাউল হুসনা, আল্লাহ মালিক | ৪ | তাকওয়া, তাওয়াক্কুল | ৪০ |
| আল্লাহ : কারীম, আলীম, হাকীম | ৫ | সত্যবাদিতা | ৪১ |
| রিসালাত | ৬ | ওয়াদা পালন, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য | ৪২ |
| আখিরাত | ৭ | আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য | ৪৩ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় : ইবাদাত | ১০-২৪ | প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ | ৪৪ |
| পবিত্রতা, নাজাসাত | ১১ | সহপাঠীদের সাথে সহাবহার, আখলাকে যামিমা, মিথ্যাচার | ৪৫ |
| ওযু, তায়াম্মুম | ১২ | গীবত বা পরনিন্দা, গালি দেওয়া | ৪৬ |
| গোসল, সালাত | ১৩ | আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, রাহ্যানি | ৪৭ |
| সালাতের সময়সূচি | ১৪ | ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল, ধূমপান | ৪৮ |
| সালাত আদায়ের নিয়ম | ১৬ | মাদকাসক্তি | ৪৯ |
| সালাতের : ফরয, ওয়াজিব | ১৮ | পঞ্চম অধ্যায় : আদর্শ জীবন চরিত | ৫২-৬৫ |
| সালাতের সুন্নাত | ১৯ | হযরত আদম (আ) | ৫২ |
| সালাতের মুস্তাহাব, সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণ | ২০ | হযরত নূহ (আ) | ৫৩ |
| সালাত মাকরুহ হওয়ার কারণ, সিজদাহ সাহু | ২১ | হযরত সালিহ (আ) | ৫৪ |
| সিজদাহ তিলাওয়াত | ২২ | বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) | ৫৪ |
| তৃতীয় অধ্যায় : কুরআন মাজীদ | | হযরত আবু বকর (রা) | ৫৬ |
| ও হাদীস শরীফ শিক্ষা | ২৫-৩৮ | হযরত উমার ফারুক (রা) | ৫৮ |
| কুরআন মাজীদ | ২৫ | হযরত উসমান (রা) | ৫৯ |
| তাজবীদ, মাখরাজ | ২৬ | হযরত আলী (রা) | ৬০ |
| সূরা আল-ফাতিহা | ২৮ | হযরত খাদিজা (রা) | ৬১ |
| সূরা আনু নাস | ২৯ | হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) | ৬২ |
| সূরা আল-ফালাক | ৩০ | হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) | ৬২ |
| সূরা আল-আসর | ৩২ | হযরত শাহ জালাল (র) | ৬৩ |
| সূরা আল-হুমাযাহ | ৩৩ | | |

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সমন্বয়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম-শিক্ষা আবশ্যিক বিষয়। শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ইসলাম-শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক শিখনফল চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন সেগুলো পুরোপুরি অর্জন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে শিখনফলভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শ্রেণীতে আকাইদ, ইবাদাত, কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা, আখলাক এবং আদর্শ জীবনচরিত সম্পর্কে স্বল্পপরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের নিয়ম-কানুন জানা ও মানা এবং মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য সহজ বাক্যরীতি, উপমা, শিক্ষামূলক কাহিনী, আদর্শ মানবের জীবনকথা ইত্যাদি অবতারণা করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টিতে পুস্তকটি সহায়ক হবে বলে মনে করি। উল্লেখ্য, কিছু আরবি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে এনসিটিবির বানানরীতি অনুসরণ না করে প্রচলিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সজ্জী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিদ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

(الْعَقَائِدُ)

(تَوْحِيدٌ)

পরিচয়

তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামী পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা এবং ইবাদাতের মালিক একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়াকে তাওহীদ বলে।

তাৎপর্য

আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি কেউ-না-কেউ তৈরি করেছেন, নিজে নিজে তৈরি হয়নি। তেমনি আমাদের মাথার ওপর বিশাল আকাশ। তাতে আছে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য। আবার আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাও কত সুন্দর। এতে আছে নদীনালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল। আরও আছে নানারকম জীবজন্তু, আছে ফল, ফুল, ফসল। এসবও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয়ই এসবেরও একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে এসব সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তিনি সমস্ত সৃষ্টির লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুরই তুলনা হয় না। একমাত্র তিনিই ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। এই বিশ্বাসের নাম তাওহীদ।

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ পাক তাঁর অস্তিত্ব ও সত্তায় যেমন একক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়, তেমনি তিনি তাঁর গুণাবলিতেও অতুলনীয়। তাঁর সত্তা ও গুণের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোনোকিছুরই নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমরা আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে জানব এবং বিশ্বাস করব। আর একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করব।

তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব

ঈমানের প্রথম কথা হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মূলকথা হল তাওহীদে বিশ্বাস। ইসলামের সকল বিধান এবং সকল শিক্ষাই তাওহীদে বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল মানুষের দিশারী হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা সবাই তাওহীদ প্রচার করেছেন, তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সঞ্চার করেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

তাওহীদে বিশ্বাসের নবীর

আমরা সবাই প্রসিদ্ধ নবী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম জানি। তিনি এক পুরোহিত-পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর সময়ের লোকেরা মূর্তিপূজা করত, শাসকের পূজা করত, রাজা নমরূদের পূজা করত। ইবরাহীম (আ) এসব মেনে নিতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, হাতে গড়া মূর্তি মানুষের উপাস্য হতে পারে না। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এসব দেখে বললেন, এসবও মাবূদ হতে পারে না। কারণ এদেরও অস্ত আছে, ক্ষয় আছে এবং বিলুপ্তি আছে। এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং নিপুণভাবে পরিচালনা করছেন, তিনিই মাবূদ। আমরা সালাতে বা নামাযে দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি করছি। আর বলছি, হে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তোমারই দিকে খাঁটিভাবে মুখ ফেরালাম। আমি মুশরিক নই, আমি তাওহীদে বিশ্বাসী।

আমরা তাওহীদের মর্ম জানব, বিশ্বাস স্থাপন করব এবং সে অনুযায়ী চলব।

কালিমা তায়্যিবা (كَلِمَةُ طَيِّبَةٍ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ]

অর্থ : “আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল।”

তাৎপর্য

এই কালিমা তায়্যিবা বা পবিত্র বাক্য তাওহীদের মূলভিত্তি। এই কালিমাটি বিশ্লেষণ করলে তিনটি অংশ পাওয়া যায়।

প্রথম অংশ

‘লা-ইলাহা’ অর্থাৎ ইবাদাতের যোগ্য কেউই নেই।

এই না-বোধক বাক্য দ্বারা কালিমাটি শুরু করা হয়েছে। এর কারণ কী? একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি, যখন কোনো পাত্রে ভালো ও পবিত্র কিছু নিতে চাই, তখন পাত্রটিকে ভালো করে পরিষ্কার ও পবিত্র করে নিই। নোংরা পাত্র ভালো জিনিস নিলে তাও খারাপ হয়ে যায়। রাসূল (স) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন আরবের লোকেরা নানারকম কাল্পনিক দেবদেবীর উপাসনা ও শিরকের দ্বারা নিজেদের অন্তর অপবিত্র করেছিল। তাই এই না-বোধক ঘোষণা দ্বারা দেবদেবীর পূজা বাতিল করা হল। তাদের অন্তর শিরকের কলুষতা থেকে পবিত্র করা হল।

দ্বিতীয় অংশ

‘ইল্লাল্লাহু’ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ, এই বলে ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্তাকেই স্বীকার করা হয়। মুমিনের অন্তর আল্লাহর আরশ। তিনি ছাড়া আর কারও স্থান সেখানে নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। মুমিন শুধু তাঁরই ইবাদাত করে। অন্য কারও সামনে মাথা নত করে না। এক আল্লাহর ইবাদাত মুমিনকে অন্য সবকিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

তৃতীয় অংশ

‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বলে মুমিন মুহাম্মাদ (স)-কে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। আল্লাহকে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, আল্লাহর রাসূলকে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। রাসূলকে বিশ্বাস না করলে আল্লাহকেও বিশ্বাস করা হয় না। কারণ রাসূলের কাছেই আল্লাহর বাণী এসেছে। রাসূলের মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। কালিমা তায়্যিবা — তাওহীদের এই মূল বাণী মানুষের চিন্তাজগতে এক বিরাট বিপ্লব এনে দেয়। মানুষকে একাধিক উপাস্য থেকে ফিরিয়ে এক আল্লাহর দিকে খাতিত করাই এই বিপ্লবের মূলকথা।

আমরা কালিমা তায়্যিবা শূন্যভাবে পড়ব। এতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব। আর এর মর্মানুসারে আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

কালিমা শাহাদাত (كَلِمَةُ شَهَادَةٍ)

আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু

ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু

ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান

আব্দুহু ওয়া রাসূলহু।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ : “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।”

তাৎপর্য

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা। তিনি অতি দয়ালু। তিনি আমাদের অফুরন্ত নি‘আমত দান করেছেন। আলো, বাতাস, আগুন, পানি সবই আল্লাহ পাকের দান। তাঁর মেহেরবানিতে আমরা বেঁচে আছি। তিনি আমাদের খাদ্য দেন, সুখ দেন, শান্তি দেন। আমরা তাঁর দয়ার কথা, দানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি। তাঁর শোকর করি। তাঁরই ইবাদাত করি। তিনি আমাদের মাবুদ, আমরা তাঁর আবদ বা বান্দা। কালিমা শাহাদাতে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য দিই। একমাত্র তাঁকেই ইবাদাতের মালিক বলে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করি। কালিমা মানে বাক্য, আর শাহাদাত মানে সাক্ষ্য দেওয়া। কালিমা শাহাদাত এমন বাক্য যা দ্বারা ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। কালিমা শাহাদাতে প্রধানত দুইটি অংশ আছে—

প্রথম অংশ

‘আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু’ দ্বারা তাওহীদের ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় অংশ

‘ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু’ দ্বারা রিসালাতের স্বীকৃতি ও ঘোষণা দেওয়া হয়। আমরা আল্লাহ-কে চিনতাম না। নবী-রাসূলগণ মানুষের কাছে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁকে খুশি করার পথ দেখিয়েছেন। তাঁরাই আমাদের আল্লাহ পাকের বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহর ইবাদাত করার নিয়ম শিখিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর বিধান পালন করে আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) যেমন আল্লাহ তাআলার রাসূল, তেমনি তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তিনিও মহান আল্লাহরই ইবাদাত করতেন। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ আল্লাহ পাকেরই ইবাদাত করতেন। কিন্তু মানুষ অনেক সময় নিজেদের মুখতার কারণে নবীগণকে অবতার ভেবে শিরক করেছে।

ঈমান মুজমাল (إِيْمَانٌ مُّجْمَلٌ)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ১. আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া | أَمْنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ |
| ২. বিআসমাইহী ওয়া সিফাতিহী | بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ |
| ৩. ওয়া কাবিলতু জামীআ | وَقَبِلْتُ جَمِيعَ |
| ৪. আহকামিহী ওয়া আরকানিহী | أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ |

অর্থ : “আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর ওপর ঠিক তেমনি, যেমন আছেন তিনি, তাঁর সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর গ্রহণ করে নিলাম তাঁর সব হুকুম আহকাম ও বিধিবিধান।”

তাৎপর্য

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত। ঈমান মুজমাল মানে সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে স্বীকার ও বিশ্বাস করাকে ঈমান মুজমাল বলে।

আল্লাহ মহান, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর আছে সুন্দর গুণ, আছে কতগুলো সুন্দর সুন্দর নাম। আল্লাহর সন্তায় যেমন বিশ্বাস করতে হয়, তেমনি তাঁর সিফাত বা গুণাবলিতেও বিশ্বাস করতে হয়। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলিতে

বিশ্বাস করার পর তাঁর আহকাম ও আরকান গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলোও মেনে চলতে হয়। আমাদের জন্য যা কল্যাণকর তিনি তা আমাদের গ্রহণ করতে বলেছেন, আর যা অকল্যাণকর তা বর্জন করতে বলেছেন। এই গ্রহণ ও বর্জনের সমন্বয়ই ঈমান।

আমরা আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ মেনে চলব। আমরা ঈমান মুজমাল শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও বলতে পারব। এর অর্থ ও বিষয়গুলো জানব এবং বলতে পারব। এতে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা শিখব পারব এবং এগুলোর প্রতি যথাযথ বিশ্বাস করব।

আসমাউল হুসনা (الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ)

আমরা জেনেছি, আল্লাহ পাক যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর গুণাবলিও অতুলনীয়। তাঁর গুণের সাথে অন্য কারও গুণের তুলনা হয় না। আল্লাহ সকল গুণের আধার। তিনি খালিক – সৃষ্টিকর্তা। তিনি রাব্বুল আলামীন – মহাপ্রতিপালক। তিনিই সবকিছুর প্রকৃত মালিক। তিনি সবকিছু জানেন, তিনিই মহাবিজ্ঞ। তাঁর অনেকগুলো গুণবাচক নাম আছে। এগুলোকে বলা হয় ‘আসমাউল হুসনা’। আসমা অর্থ নামসমূহ। আর হুসনা অর্থ সুন্দর সুন্দর। আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দর সুন্দর নাম। কুরআন মাজীদে আছে–

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۝

অর্থ : “আল্লাহর কতগুলো সুন্দর সুন্দর নাম আছে। তাঁকে সে নামগুলো দ্বারা ডাকো।”

কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাকের অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের গুণাবলির বিকাশ দেখতে চান। আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হলে চরিত্র সুন্দর হয়। খুব ভালো মানুষ হওয়া যায়। আল্লাহ ন্যায়বিচারক। তিনি চান আমরাও ন্যায়বিচার করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি চান আমরাও যেন অন্যকে ক্ষমা করি। ইসলামে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ ۝

অর্থ : “তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।”

আমরা আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো জানব। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো মানুষের জীবনের জন্য আদর্শ। আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা থাকলে তাঁর আদেশমতো চলা সহজ হয়। অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। আমরা ‘আসমাউল হুসনা’- এর মর্মানুসারে আমাদের জীবন গঠনে ব্রতী হব।

আল্লাহ মালিক (اللَّهُ مَالِكٌ)

মালিক শব্দের অর্থ অধিকারী। আল্লাহ সবকিছুর প্রকৃত মালিক। সবকিছুর অধিকারী। এই যে বিশাল পৃথিবী – এতে আছে নদীনালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত। আছে ছোট বড় অনেক প্রাণী, জীবজন্তু, গাছপালা, ফুল ও ফসল। আমাদের মাথার উপর আছে নীল আকাশ। মহাকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্র। পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক-একটি নক্ষত্র। কী বিশাল এ সৃষ্টি। আসমান যমীনে যা-কিছু আছে সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই আমাদের জীবনমৃত্যুর মালিক। ধনসম্পদের মালিকও আল্লাহ। আমরা এসবের সাময়িক আমানতদার মাত্র।

আমরা আল্লাহ তাআলাকে আমাদের জানমালের মালিক বিশ্বাস করব। তাঁর নিআমতের শোকর করব এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলব।

আল্লাহ কারীম (اللَّهُ كَرِيمٌ)

কারীম শব্দের অর্থ উদার, মহানুভব, মহামহিম, দয়াময় ইত্যাদি। দয়া, কৃপা, ক্ষমা, সহনশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা প্রভৃতি গুণাবলির সমাবেশ পূর্ণমাত্রায় যে সত্তার মধ্যে বিদ্যমান তাঁকেই বলা হয় কারীম। আর এসবের সমাবেশ পূর্ণমাত্রায় একমাত্র আল্লাহ পাকের মধ্যেই বিদ্যমান। আল্লাহ কারীম মানে আল্লাহ মহানুভব, মহামহিম, উদার ও দয়াময়।

আল্লাহ পাকের দয়া ও দানের সাথে কারও তুলনা হয় না। চন্দ্র, সূর্য, আলো, বাতাস, আগুন, পানি, গাছপালা, জীবজন্তু এ সবকিছুই তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নি‘আমত অফুরন্ত। আমরা তাঁর দয়াতেই বেঁচে আছি। এত সব নি‘আমত ভোগ করেও আমরা তাঁর শোকর করি না। কিন্তু তবুও তিনি আমাদের সাথে সাথে শাস্তি দেন না। এ হচ্ছে তাঁর উদারতা, মহানুভবতা।

আল্লাহ আলীম (اللَّهُ عَلِيمٌ)

আলীম শব্দের অর্থ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ পাক অসীম জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করার মতো কিছুই নেই। আসমান জমিনের কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়।

আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও গতিবিধি সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি আমাদের অন্তরের খবরও জানেন। কুরআন মাজীদে আছে—

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

অর্থ : “আল্লাহ অন্তরসমূহের খবর জানেন।”

অন্য সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমরা অন্তরে যে চিন্তা করি তাও তিনি জানেন। তাঁর কাছে ভালোমন্দ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে হাযির নাযির জেনে আমরা আমাদের কাজকর্ম করব।

আলীম গুণের আদর্শে আমরা জ্ঞানার্জনে ব্রতী হব। জ্ঞানে গুণে আমাদের জীবন উন্নত করব। আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান কল্যাণের কাজে ব্যবহার করে আমাদের এ পৃথিবীকে কল্যাণময় করে তুলব।

আল্লাহ হাকীম (اللَّهُ حَكِيمٌ)

হাকীম শব্দের অর্থ মহাবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, অত্যন্ত দক্ষ, সুনিপুণ, হিকমত ও কৌশলের অধিকারী। আল্লাহ হাকীম মানে আল্লাহ তাআলা মহাপ্রজ্ঞাময়। সুনিপুণ, হিকমত ও কৌশলের অধিকারী। তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজির উদয়-অস্ত, রাত-দিনের আবর্তন, বাতাসের গতি পরিবর্তন, নদী-সাগরের জোয়ারভাঁটা, ফুল-ফলের বিচিত্র রং, রূপ, গন্ধ ও স্বাদ, জীব ও উদ্ভিদের জীবনমরণ—এ সবের মধ্যেই আল্লাহ পাকের হিকমতের পরিচয় ও প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহর এই সুবিশাল সৃষ্টি, সুনিপুণ সৃষ্টিকৌশলের কথা ভাবলে আমরা বিস্মিত হই। শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে তাঁর সামনে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়।

আমরা মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করব। তাঁর গুণবাচক নামের আদর্শে আমাদের নিজেদের গড়ে তুলব এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী হব।

আমরা আসমাউল হুসনার পরিচয় ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারব। মালিক, কারীম, আলীম ও হাকীম— আল্লাহ পাকের এই গুণবাচক নামগুলোর অনুকরণে আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

রিসালাত (رِسَالَة)

মু'মিন হতে হলে যেমন তাওহীদে বিশ্বাস করতে হয় তেমনি রিসালাতেও বিশ্বাস করতে হয়। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে তাওহীদে বিশ্বাস হয় না।

রিসালাতের পরিচয়

রিসালাত শব্দের অর্থ বার্তা, চিঠি বা সংবাদ বহন। রাসূলগণের দায়িত্বকে রিসালাত বলে। রিসালাতকে নবুওয়্যাতও বলা হয়।

নবী-রাসূলের পরিচয়

যে সকল মহাপুরুষ নবুওয়্যাত বা রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরা হলেন নবী-রাসূল। তাঁদের কাছে আল্লাহ পাকের বাণী আসত। তাঁরা নিজেরা আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানুষের মহান শিক্ষক। নবী-রাসূলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী।

তাঁরা কখনও মিথ্যা বলতেন না। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁদের মধ্যে লোভ-লালসা ছিল না। তাঁরা ছিলেন মানবদরদী। তাঁরা আজীবন কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। পৃথিবীতে অনেক নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ)। আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)।

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাদের কাছে আসমানী কিতাব আসত তাঁরা হলেন রাসূল। আর যাদের কাছে আসমানী কিতাব আসত না তাঁরা নবী। অতএব, প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবী রাসূল নন। আসমানী কিতাব প্রাপ্ত নন এমন নবীগণ পূর্ববর্তী কিতাব অনুসারে দীন প্রচার করতেন।

রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

১. নবী-রাসূলগণ আমাদেরকে আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন।
২. কোনটি সঠিক পথ, কোনটি ভুল পথ, কোন পথ ভালো আর কোন পথ মন্দ আমরা তা জানতাম না। প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) আমাদের ভালোমন্দ পথের নির্দেশনা দিয়েছেন।
৩. নবী-রাসূলগণ নিজেরা আল্লাহর বিধান পালন করে মানুষদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন।
৪. নবী-রাসূলগণ ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্য ডাকতেন।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহীদে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, রিসালাতে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। আল্লাহর বাণী আসত রাসূলগণের কাছে। রাসূলগণ তা মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। রাসূলকে বিশ্বাস না করলে আল্লাহর বাণীকেও বিশ্বাস করা হয় না। আর আল্লাহর বাণী অবিশ্বাস করলে আল্লাহকেই অবিশ্বাস করা হয়। সুতরাং রিসালাতে বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ।

আমরা রিসালাতের অর্থ বলতে পারব। নবী-রাসূলের পরিচয় বলতে পারব। নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব। রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে পারব।

আমরা সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করব। তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাব আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনাদর্শ মেনে চলব।

আখিরাত (اٰخِرَةُ)

আখিরাত মানে পরকাল। ইহকালের পরের জীবনকে বলে পরকাল। মৃত্যুর পর থেকেই আখিরাতের জীবন। আখিরাতের জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। সে জীবন অনন্তকালের। মানুষ ইহকালে যেমন কাজ করবে, পরকালে তেমন তার ফল ভোগ করবে। মহানবী (স) বলেছেন, “দুনিয়া হল আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।”

গুরুত্ব ও প্রভাব

তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, আখিরাতে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। আখিরাতের বিশ্বাস মানবচরিত্রে খুব ভালো প্রভাব ফেলে। এ বিশ্বাস মানুষকে ইহকালের কাজকর্ম সম্বন্ধে সতর্ক ও সৎকর্মশীল করে তোলে। কারণ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, ইহকালের ভালোমন্দ কাজের হিসাব পরকালে আল্লাহর কাছে দিতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তির ভয়ে মন্দকাজ থেকে বিরত থাকে। আর পুরস্কারের আশায় ভালো কাজে আগ্রহী হয়। এতে তার চরিত্র উন্নত হয়।

কবর

আখিরাতের জীবনের প্রথম ধাপ হল কবর বা আলমে বারযাখ। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে বলে আলমে বারযাখ।

আলমে বারযাখে ‘মুনকার নাকীর’ নামে দুইজন ফেরেশতা তিনটি প্রশ্ন করবেন। যাদের কবর দেওয়া হয় না তারাও এ থেকে রেহাই পায় না। প্রশ্ন করা হবে রব (প্রভু), দীন ও রাসূল সম্বন্ধে। ইহজীবনে যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তারা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে। তাদের কবর হবে জান্নাতের মতোই সুখের স্থান।

যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চলে না, তারা সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে না। তারা শুধু আফসোস করবে। তাদের কবর হবে অত্যন্ত কষ্টের স্থান। কবরেও তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

কিয়ামত

এমন একসময় ছিল যখন বিশ্বজগৎ কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার এমন একসময় আসবে যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাবে, তাঁর নাম নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহ বিশ্বজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। একেই বলে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। কুরআন মাজীদে আছে—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

অর্থ : “পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।” (আর রাহমান : ২৬)

ইসরাফীল (আ)-এর প্রথম ফুঁকে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দ্বিতীয় ফুঁকে মানুষ কবর থেকে এবং যে যেখানে আছে সেখান থেকে উঠবে। এই উত্থানকে কিয়ামত বলা হয়। একে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানও বলা হয়ে থাকে।

হাশর

পুনরুত্থানের পর ভীত-শঙ্কিত জিন ও মানুষ একজন আহবানকারী ফেরেশতার ডাকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। একে বলা হয় হাশর। হাশরে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। ইহকালে যারা ঈমান এনেছে, ভালো কাজ করেছে, তাঁরা আল্লাহর রহমত পাবে, আরামে থাকবে। আর যারা ঈমান আনেনি, ভালো কাজ করেনি, তাদের ভীষণ আযাব হবে। তাদের কষ্টের সীমা থাকবে না। সূর্য অতি নিকটবর্তী স্থান

থেকে সেদিন প্রচণ্ড প্রতাপে তাপ ঝরাতে থাকবে। পাপীরা সূর্যতাপে দহনে ভীষণভাবে ঘর্মাক্ত হতে থাকবে। সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। পুণ্যবানরা আরশের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে এবং আরামে থাকবে। হাশরের দিন মানুষ দুনিয়ার কৃতকর্মের খতিয়ান সংবলিত আমলনামা দেখতে পাবে। শুরু হবে অতি সুক্ষ্ম বিচার। স্বয়ং আল্লাহ হবেন বিচারক। নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণ হবে সাক্ষী। নিজের অজ্ঞ-প্রত্যজ্ঞও সাক্ষ্য দিবে। হাশরের দিন মীযান দ্বারা পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে। যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে, তারা জান্নাত লাভ করবে। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে, তারা হবে জাহান্নামী। জান্নাত হল অকল্পনীয় সুখের স্থান আর জাহান্নাম হল অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও আযাবের স্থান।

আমরা এ বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব। আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয়ে দুনিয়ার জীবন সম্বন্ধে সতর্ক হব। দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির উদ্দেশ্যে কাজ করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। তাওহীদ শব্দের অর্থ—

| | |
|--------------|------------------|
| ক. বহুত্ববাদ | খ. ত্রিতত্ত্ববাদ |
| গ. একত্ববাদ | ঘ. রিসালাত |
- ২। মানুষের কাছে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছেন —

| | |
|--------------------|----------------|
| ক. আউলিয়া দরবেশ | খ. পীর-ফকীরগণ |
| গ. সাহাবায়ে কেরাম | ঘ. নবী-রাসূলগণ |
- ৩। মানুষ আল্লাহর খলিফা আর খলিফার কাজ হচ্ছে —

| | |
|---------------------|-----------------------|
| ক. প্রতিনিধিত্ব করা | খ. রাজ্য শাসন করা |
| গ. সমাজসেবা করা | ঘ. পাঞ্জাবি সেলাই করা |
- ৪। রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন —

| | |
|-----------------------|-----------------|
| ক. হযরত জিব্রাইল (আ) | খ. নবী-রাসূলগণ |
| গ. হযরত মুহাম্মাদ (স) | ঘ. হযরত আদম (আ) |
- ৫। কিয়ামত দিবসে হযরত ইসরাফীল (আ) যখন দ্বিতীয় ফুঁক দিবেন, তখন—

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ক. সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে | খ. মানুষ কবর থেকে উঠে আসবে |
| গ. বিচারকাজ শুরু হবে | ঘ. পাহাড়গুলো তুলার মতো উড়বে |

নিচের তথ্যের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

অহিদুল ইসলাম একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মনের ভেতরে একটি গভীর ভাবনা এল: কবরে মৃত ব্যক্তিটি কী অবস্থায় আছে? মৃত্যু হওয়ার পর আমার কী অবস্থা হবে? তার মনে পড়ল, তার এক বন্ধু লঞ্চড্রুবিতে মারা যায়, কিন্তু তাকে আর কবর দেয়া সম্ভব হয়নি।

৬। কবরে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে —

- | | |
|--------|--------|
| ক. ৫টি | খ. ৭টি |
| গ. ২টি | ঘ. ৩টি |

৭। যাদেরকে কবর দেয়া সম্ভব হয়নি—

ক. তারা বেহেশতের সুখ লাভ করবে

খ. অন্যদের মতো তাদেরকেও প্রশ্ন করা হবে

গ. তাদের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন

ঘ. তারা কিয়ামত পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চাকরিজীবী রফিক সাহেব বলেন: চাকরির কারণেই আমি বাড়ি গাড়ি সবকিছুই করেছি। শফিক সাহেব বলেন: আমার বাবা চাকরি করে বাড়ি গাড়ি করতে পারেননি। আমি আল্লাহর সাহায্যেই ব্যবসায় উন্নতি করেছি এবং বাড়ি গাড়ি করতে পেরেছি। আল্লাহ আমাদের অফুরন্ত নিআমত দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সম্মান, সুখ, শান্তি, সবকিছু আল্লাহর মেহেরবানিতে হয়। আসলে চাকরি বা ব্যবসায় এগুলো অর্জিত হয় না। এ সবকিছুর মূল বিশ্বাস হল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ক. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—অর্থ কী?

খ. আল্লাহ মানুষকে আহার দেন—বুঝিয়ে লেখ।

গ. আকাইদের দৃষ্টিতে শফিক সাহেব ও রফিক সাহেবের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘সবকিছু আল্লাহর মেহেরবানিতে হয়’—বিষয়টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২। সুযোগ পেলেই আরিফ অন্যের জিনিস চুরি করে। এ নিয়ে মানুষ আরিফের বাবাকে অভিযোগ করলে তিনি খুব কষ্ট পান এবং ছেলেকে ডেকে বলেন: দুনিয়ার ভালো-মন্দ কাজের জন্য আমাদেরকে আল্লাহর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি একখানা হাদীস শোনান—‘দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র’।

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী?

খ. ‘দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র’—সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

গ. কীভাবে আরিফের চুরি করার অভ্যাসটি সংশোধন করা যায়?

ঘ. আখিরাতের বিশ্বাস আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করে—আলোচনা কর।

৩। আবু হালেহ একজন মেধাবী ছাত্র। সে সকল বিষয়ে জানতে আগ্রহী। একদিন সে তার পাঠ্যবইয়ে কালিমার অর্থ পড়ল: “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল।” প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বাবা রিসালাতের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের আগমনের কারণ বর্ণনা করেন।

ক. রিসালাতের অর্থ কী?

খ. নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লেখ।

গ. একজন মুসলমান হিসেবে আবু সালেহকে রিসালাতে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ঘ. আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল—এ কালিমাটি ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত (عِبَادَةُ)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের লালনপালন করেন। তিনিই আমাদের রব। আমরা তাঁর বান্দা। আমাদের জীবন-মরণ তাঁর হাতে। তিনি আমাদের জন্য এই মহাবিশ্বকে কত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আসমান-জমিন, চাঁদ-সুৰুজ, ফল-ফুল, নদী-নালা সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা সব ভোগ করি। আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছেন। আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিআমত ভোগ করার পর এর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। নিআমতের শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর দেওয়া বিধানমতো চলার নামই ইবাদাত। আমরা আল্লাহর হুকুমমতো চলব এবং তাঁরই ইবাদাত করব।

ইবাদাত আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব ও আনুগত্য। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যই হল ইবাদাত। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদাত। আল্লাহ তাআলা সকল জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। এ সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

অর্থ : “আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (সূরা যারিয়াত : ৫৬)
নবী কারীম (স) ইবাদাত সম্পর্কে বলেছেন—

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ۝

অর্থ: “যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পরামর্শ বা সম্বধান দেবে, সে ঐ কাজটি সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব পাবে।” (মুসলিম)

আমরা ভালো কাজ করব। অন্যকে সৎকাজের পরামর্শ দেব। আমাদের পরামর্শ পেয়ে তারা ভালো কাজ করবে, সাওয়াব পাবে। আমরাও তাদের সমান সাওয়াব পাব। আমাদের জন্য সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি কতগুলো নির্ধারিত ইবাদাত রয়েছে। এগুলো নবী কারীম (স) যেভাবে আদায় করেছেন, আমাদেরকে করতে বলেছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই আদায় করব। এই ইবাদাতগুলোকে তিন ভাগ করা যায়—

১. ইবাদাতে বাদানী বা শারীরিক ইবাদাত।
২. ইবাদাতে মালী বা আর্থিক ইবাদাত।
৩. ইবাদাতে মালী ও বাদানী বা শরীর ও অর্থ উভয়ের সর্থমিশ্রণে ইবাদাত।

শারীরিক ইবাদাত

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে ইবাদাত করা হয় তাকে বলা হয় ইবাদাতে বাদানী বা শারীরিক ইবাদাত। যথা—দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ও রমযান মাসে সাওম বা রোযা রাখা। ইবাদাতের মধ্যে শারীরিক ইবাদাত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক ইবাদাত

অর্থের দ্বারা যে ইবাদাত করতে হয় সেগুলোকে বলা হয় ইবাদাতে মালী বা আর্থিক ইবাদাত। যেমন—যাকাত দেওয়া, সাদকা ও দান-খয়রাত করা ইত্যাদি।

শরীর ও অর্থ উভয়ের সংমিশ্রণে ইবাদাত

উল্লিখিত দুই প্রকার ইবাদাত ছাড়াও এমন কিছু ইবাদাত আছে যা শুধু শরীর দ্বারা বা কেবল অর্থ দ্বারা করা যায় না। বরং শরীর এবং অর্থ উভয়ের প্রয়োজন। যেমন হাজ্জ করা, জিহাদ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদের ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, কাজেই সর্বক্ষণ তাঁর ইবাদাতে মশগুল থাকা আমাদের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সর্বক্ষণই কি ইবাদাত করা সম্ভব? হ্যাঁ, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ইবাদাত করা সম্ভব। যেমন আমরা খেতে বসলে যদি বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করি, তবে যতক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকব ততক্ষণ আল্লাহর রহমত পেতে থাকব। এটিই ইবাদাত। পড়ার সময় যদি বিসমিল্লাহ বলে পড়া শুরু করি তবে যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া করব, ততক্ষণই ইবাদাতে গণ্য হবে। স্কুলে যাবার সময় বিসমিল্লাহ বলে যাত্রা শুরু করলে রাস্তার সকল বিপদাপদ থেকে আল্লাহ আমাদের হেফায়ত করবেন। রাস্তার একটি অশ্লীলোক রাস্তা পার হতে পারছে না, তাকে হাত ধরে পার করে দিলে তাও আল্লাহর নিকট ইবাদাত বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে সর্বক্ষণ ইবাদাতে আমরা মশগুল থাকতে পারি। ইবাদাত করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখময় হয়। পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জান্নাত লাভ করা যায়। আর যারা ইবাদাত করে না, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে না, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তারা দুনিয়াতে শান্তি পায় না। পরকালেও তাদেরকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

পবিত্রতা (طَهَارَةٌ)

ইবাদাতের জন্য পাকপবিত্র থাকা প্রয়োজন। পাকসাফ না হয়ে সালাত আদায় করা যায় না। অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষেধ। কাজেই আমাদের পাক-পবিত্র থাকা প্রয়োজন।

তাহারাত অর্থ পবিত্রতা। যেমন ওয়ু করা, গোসল করা ইত্যাদি। পবিত্রতা ছাড়া ইবাদাত কবুল হয় না। পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে, লেখাপড়া কাজকর্মে মন বসে। পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন—

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝

অর্থ : “যারা পাকসাফ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন।” (তাওবা : ১০৮)
মহানবী (স) বলেন—

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ -

অর্থ : “পাক পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।”

কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা থাকলে চলবে না। শরীর, পোশাক পরিষ্কার রাখার সাথে সাথে মন ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে।

নাজাসাত (نَجَاسَةٌ)

নাজাসাত অর্থ অপবিত্রতা, মলিনতা। এটি হল তাহারাতের বিপরীত। নাজাসাত দুই প্রকার: ১. নাজাসাতে হাকীকী
২. নাজাসাতে হুকমী।

নাজাসাতে হাকীকী

নাজাসাতে হাকীকী হচ্ছে ঐ সকল নাপাক বস্তু যাতে মানুষের মনে ঋভাবত ঘৃণা আসে। প্রত্যেকে এগুলো থেকে নিজের শরীর, জামাকাপড় ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিসপত্র বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ইসলাম এসব থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন— পেশাব-পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি।

নাজাসাতে হুকমী

নাজাসাতে হুকমী ঐসব নাজাসাত যা দেখা যায় না, কিন্তু ইসলামী বিধানে তা নাজাসাত বলে গণ্য। যেমন- ওয়ূ ভজ্জা হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি।

পবিত্রতা অর্জনের অনেক নিয়ম আছে। ওয়ূ তার মধ্যে একটি উত্তম নিয়ম। ওয়ূ ছাড়া সালাত আদায় হয় না, কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যায় না। আমরা সালাতের আগে ওয়ূ করে নেব।

ওয়ূ (الْوُضُوءُ)

শরীর পবিত্র করার নিয়্যাতে পাক পানি দিয়ে শরীআতের নিয়ম মোতাবেক নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার নামই ওয়ূ। ওয়ূর গুরুত্ব বর্ণনা করে কুরআন পাকে বলা হয়েছে- “যারা ঈমান এনেছ জেনে রেখো, যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে তার আগে নিজেদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নেবে, তোমাদের দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে, মাথা মাসেহ করবে এবং উভয় পা গিরাসহ ধুয়ে নেবে।” (মায়িদাহ : ৬)

নবী কারীম (স) বলেন, “আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে চিনতে পারব।” জনৈক সাহাবী বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনি কীভাবে আমাদের চিনবেন?” নবীজী বললেন, “ওয়ূর ফলে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় ঝকঝক করবে। তাতেই আমি আমার উম্মতকে চিনতে পারব।” কাজেই এই ফযিলত পাবার আশায় আমাদের অতি উত্তমরূপে ওয়ূ করতে হবে।

ওয়ূর নিয়ম

মনে মনে পবিত্রতা হাসিলের নিয়্যাত করে বিস্মিল্লাহ বলে প্রথমে দুই হাত কজি পর্যন্ত ধুয়ে তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে। রোযা না থাকলে তিনবারই গড়গড়া করে কুলি করতে হবে। এরপর নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করতে হবে। তারপর তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল এমনভাবে ধুতে হবে যাতে চুল পরিমাণ স্থান শুকনো না থাকে। দাড়ি ঘন হলে খিলাল করতে হবে। এরপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিতে হবে। হাতে আর্থি থাকলে বা মেয়েদের হাতে চুড়ি থাকলে তা নাড়াচাড়া করতে হবে যেন সবখানে পানি পৌঁছে যায়। তারপর দুই হাত ভিজিয়ে মাথা এবং কান মাসেহ করতে হবে। মাসেহ করার সময় দুই হাতের বুড়ো এবং শাহাদাত অঙ্গুলি আলাদা রেখে বাকি তিন তিন অঙ্গুলি মিলিয়ে অঙ্গুলিগুলোর ভিতর দিক দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে পেছনদিকে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করতে হবে। তারপর দুই হাতের তালু পেছনদিক থেকে সামনের দিকে টেনে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করতে হবে। এরপর শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে হাতের অঙ্গুলিগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ করতে হবে। মাসেহ করার পর দুই টাখনু পর্যন্ত ভালো করে ধুতে হবে যাতে একটু জায়গাও বাকি না থাকে।

ওয়ূর কাজগুলো পর পর করে যেতে হবে। অর্থাৎ একটার পর একটা সজো সজো ধুতে হবে। অনেকক্ষণ থেমে থেমে করা যাবে না।

তায়াম্মুম (التَّيَمُّمُ)

ওয়ূ কিংবা গোসলের প্রয়োজনে পবিত্র পানি পাওয়া না গেলে অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্র মাটি বা ঐজাতীয় পবিত্র বস্তু (যেমন-পাথর, চুনা, বালু ইত্যাদি) দিয়ে শরীর পাক করাকে তায়াম্মুম বলে।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

পবিত্রতা হাসিলের নিয়্যাতে প্রথমে পাক মাটিতে দুই হাত লাগিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ্ করা। পুনরায় মাটিতে দুই হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করা। তায়াম্মুমে নিয়্যাত করা ফরয।

গোসল (غُسْلُ)

গোসলের আভিধানিক অর্থ ধৌত করা। শরীআতের নিয়ম মোতাবেক নাপাকী দূর করার উদ্দেশ্যে সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলে।

গোসলের নিয়ম

প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কজি পর্যন্ত ভালো করে ধুতে হবে। তারপর শরীরের কোথাও নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দুই হাত ভালোভাবে ধুয়ে ওয়ূ করতে হবে। কুলি করার সময় কণ্ঠদেশে এবং নাকের ভিতর পানি ভালো করে পৌঁছাতে হবে। ওয়ূর পর মাথায় পানি ঢালতে হবে। এরপর ডান কাঁধে, তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ভালো করে ঘষতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে এবং শরীর ভালোভাবে পরিষ্কার হয়। এরপর শরীরে দুইবার এমনভাবে পানি ঢালতে হবে যেন কোনো স্থান শুকনো থাকার আশঙ্কা না থাকে। ওয়ূর সময় পা না ধুয়ে থাকলে এখন পা ধুতে হবে। সবশেষে সমস্ত শরীর কোনো কাপড় বা গামছা দিয়ে মুছে শুকনো কাপড় পরতে হবে। মেয়েদের জন্য খোঁপা বা বেণী খোলার প্রয়োজন নেই, তবে চুলের গোড়ায় অবশ্যই পানি পৌঁছাতে হবে।

এ পাঠ থেকে আমরা —

১. তাহারাৎ ও নাজাসাতের ব্যাখ্যা করতে পারব।
২. তাহারাৎের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
৩. ওয়ূ, গোসল ও তায়াম্মুম করার নিয়ম বলতে পারব।
৪. নিয়মিত ওয়ূ, গোসলের মাধ্যমে পাকপবিত্র থাকতে অভ্যস্ত হব।

সালাত (الصَّلَاةُ)

আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের যত নিয়ম আছে তার মধ্যে সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ। কালিমা, সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত-ইসলামের এই পাঁচটি রুকন্ বা স্তম্ভের মধ্যে সালাত অত্যন্ত পুরুত্বপূর্ণ। সালাতের আভিধানিক অর্থ নামায পড়া, দুআ করা, স্থায়ীভাবে সরলপথে থাকা। ইসলামের পরিভাষায়: আরকান আহকামসহ বিশেষ নিয়মে আল্লাহর ইবাদাতের নাম সালাত। সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করতে পারে। সালাত মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ : “নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (আনকাবুত : ৪৫)

মহানবী (স) এ সম্পর্কে বলেন— কোনো বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করলে আল্লাহ তাআলা পাঁচটি পুরস্কার দেবেন।

- | | |
|----------------------------------|---|
| ১. তার জীবিকার অভাব দূর করবেন। | ৪. পুলসিরাত বিজলির মতো তাড়াতাড়ি পার করাবেন। |
| ২. কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন। | ৫. বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন। |
| ৩. হাশরে আমলনামা ডান হাতে দেবেন। | |

সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেন- **الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ** -

অর্থ : “সালাত দীন ইসলামের খুঁটিস্বরূপ।”

যে সালাত কায়েম করল সে তাঁর দীনরূপ ইমারতটি ঠিক রাখল। আর যে সালাত ত্যাগ করল সে তার দীন ইমারতটি ভেঙে ফেলল।

নবীজী বলেছেন: **الصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ** - “সালাত জান্নাতের চাবি।” কারও হাতে কোনো ঘরের চাবি থাকলে যেমন অতি সহজেই সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে সে অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আমরা সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারব। দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তির জন্য যথাযথভাবে সালাত কায়েম করব।

সালাতের সময়সূচি (أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। যথাসময়ে আদায় না করলে সালাত আদায় হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- “নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের ফরয।” (নিসা : ১০৪)

ওয়াক্ত

সালাত কায়েমের সময় সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। নিচে সালাতের ওয়াক্তের বিবরণ দেওয়া হল-

ফজর ফজরের সালাতের সময় আরম্ভ হয় সুবহি-সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। আকাশের পূর্ব দিগন্তে লক্ষ্যমান যে আলোর রেখা দেখা দেয় তাকেই বলে সুবহি-সাদিক। এই আলো ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শেষে সূর্যোদয় ঘটে।

যুহর দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিমআকাশে হেলে পড়লেই যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং প্রত্যেক বস্তুর ছায়া ‘ছায়া আসলি’ বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময়ে যে একটু ছায়া থাকে তাকেই ‘ছায়া আসলি’ বা আসল ছায়া বলে। যেমন এক হাত লম্বা একটি কাঠির আসল ছায়া দুপুরবেলা চার আঙুল ছিল। তারপর যখন ঐ কাঠির ছায়া দুই হাত চার আঙুল হবে তখন যুহরের ওয়াক্তও শেষ হয়ে যাবে।

আসর যুহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে সূর্যের বর্ণ হলুদ রং ধারণ করলে আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহ।

মাগরিব সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং পশ্চিমআকাশে যতক্ষণ লালিমা থাকে ততক্ষণ সময় থাকে। মাগরিবের সময় খুবই কম। তাই সময় হওয়ার সাথে সাথেই সালাত আদায় করে নেওয়া উত্তম।

ইশা মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর ইশার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহি-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যে আদায় করা উত্তম। রাত দ্বিপ্রহরের পর আদায় করা মাকরুহ।

বিতর বিতর-এর আসল সময় শেষরাত। তবে ইশার সালাতের সাথেও আদায় করা যায়। কিন্তু ইশার আগে পড়া যায় না।

নিম্নে সালাতের সময়সূচির একটি সংক্ষিপ্ত চার্ট দেওয়া হল—

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|-----------|--|--|
| ১. ফজর | সুবহি-সাদিকের পর থেকে | সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। |
| ২. যুহর | সূর্য পশ্চিমআকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে | কোনো বস্তুর ছায়া, আসল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। |
| ৩. আসর | যুহরের ওয়াক্ত শেষ হলে। | সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। |
| ৪. মাগরিব | সূর্যাস্তের পর থেকে | পশ্চিমাকাশে লালিমা থাকা পর্যন্ত। |
| ৫. ইশা | মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলে। | সুবহি-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। |
| ৬. বিতর | ইশার পর থেকে | সুবহি-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। |

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময় সালাত পড়া নিষেধ :

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়।
২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়।
৩. সূর্যাস্তের সময়। তবে কোনো কারণে ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় করা না হলে তা ঐ সময় আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরুহ হবে।

সালাতের মাকরুহ সময়

নিচে বর্ণিত সময়ে পূর্বের কোনো ওয়াক্তের ফরয ও ওয়াজিব কাযা ব্যতীত অন্য সালাত পড়া মাকরুহ।

| | |
|---|---|
| ১. ফজরের সালাতের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। | ৫. মাগরিবের সময় ঐ ওয়াক্তের ফরযের আগে। |
| ২. আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। | ৬. যখন ইমাম জুমআর খুতবা দিতে থাকেন তখন। |
| ৩. ফজরের সময় হলে ঐ ওয়াক্তের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত পড়া। | ৭. ইশার সালাত মধ্যরাতের পরে পড়া। |
| ৪. ফরয সালাতের যখন তাকবির দেওয়া হয় তখন অন্য সালাত শুরু করা। | |

সালাতের মুস্তাহাব সময়

সালাতের মুস্তাহাব বা উত্তম সময় হল—

১. ফজরের সালাত ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা।
২. যুহরের সালাত গরমের দিনে সূর্যের তাপ কিছুটা কমলে অর্থাৎ কিছুক্ষণ বিলম্ব করে পড়া।
৩. মাগরিবের সালাত সময় হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা।
৪. ইশার সালাত রাতের প্রথমে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে পড়া।

সালাত আদায়ের নিয়ম

সব কাজের একটি নিয়ম আছে। নিয়মমতো কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। সালাত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, যা মহানবী (স) আমাদেরকে বাস্তব আমল দ্বারা শিখিয়েছেন।

কোনোপ্রকার ভুল হলে সালাতের ক্ষতি হয়, গুনাহ হয়। ভুল সালাত আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। দুই, তিন ও চার রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়মের কিছুটা তারতম্য আছে। নিচে এর পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হল।

দুই রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সালাতের শর্তগুলোর কোনোটাই যেন বাদ না পড়ে। পাকপবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন। কিবলামুখী হয়ে নিয়্যাত করে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে “আল্লাহু আকবার” বলে নাভির উপর হাত বাঁধব। স্ত্রীলোকগণ হাত বাঁধবে বুকের উপর। নিয়্যাত মনে মনে করলেই চলবে। তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। এরপর “সানা” পড়ব। এরপর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। ফাতিহা পড়ে মনে মনে “আমীন” বলব। এরপর অন্য কোনো সূরার কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি সূরা পড়ব। তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে রুকু করব। রুকুতে কমপক্ষে তিনবার “সুবহানা রাবিয়াল আযীম” বলব। তারপর “সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্” বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় “রাব্বানা লাকাল হামদ” বলব। তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে সিজদাহ করব। সিজদায় অন্তত তিনবার “সুবহানা রাবিয়াল আলা” বলব। তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে সোজা হয়ে বসব। আবার “আল্লাহু আকবার” বলে দ্বিতীয় সিজদাহ করব। এবারও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার “সুবহানা রাবিয়াল আলা” বলব। এরপর “আল্লাহু আকবার” বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এভাবে প্রথম রাকা'আত শেষ হবে।

এখন দ্বিতীয় রাকা'আত শুরু হল। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর পূর্বের মতো সূরা মিলাব। তারপর প্রথম রাকা'আতের মতো রুকু ও সিজদাহ করে সোজা হয়ে বসব। তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ মাসূরা পড়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ” বলব। এইভাবে দুই রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

তিন রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

তিন রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দ্বিতীয় রাকা'আতের পর শুধু তাশাহুদ পড়ব। তারপর তাকবীর বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। অন্য কোনো সূরা পড়ব না। এরপর পূর্বের মতো রুকু সিজদাহ করব। সিজদার পর সোজা হয়ে বসে তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ মাসূরা পড়ে ডানে-বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

চার রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দ্বিতীয় রাকা'আতের পর শুধু তাশাহুদ পড়ব। পরে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য তাকবীর বলে উঠে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর রুকু সিজদাহ করে চতুর্থ রাকা'আতের জন্য উঠে দাঁড়াব। চতুর্থ রাকা'আতে তৃতীয় রাকা'আতের মতো সূরা ফাতিহা পড়ে রুকু, সিজদাহ করার পর বসে তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ মাসূরা পড়ে ডানে-বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব। সালাত ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল হলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব।

জামা'আতে সালাত

আমরা বাড়িতে বা অন্য কোনো স্থানে সালাত পড়লেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সালাত আদায়ের উত্তম স্থান হল মসজিদ। মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় করলে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। মসজিদ আল্লাহর ঘর। আমাদের বাড়িতে কোনো মেহমান এলে যেমন আমরা খুশি হই, ঠিক তেমনি বান্দা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলে আল্লাহ তাআলা খুশি হন। জামা'আতে সালাত আদায় করা সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে—

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ۝

অর্থ : “তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।” (বাকারাহ : ৪৩)

অর্থাৎ জামা'আতে সালাত আদায় কর। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের সাথে যখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে থাকে তখনও জামা'আতে সালাত কয়েমের তাকিদ করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি চল্লিশদিন পর্যন্ত নিয়মিত জামাআতের সাথে সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে অব্যাহতি দিবেন।”

নবীজী বলেন, “যারা অন্ধকার রাতে কষ্ট করে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায় তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, কিয়ামতের দিন তারা পরিপূর্ণ আলো পাবে।” (তিরমিযী)

যারা ইচ্ছা করে জামা'আতে शामिल হয় না তাদের সম্পর্কে প্রিয় নবী (স) বলেন, “আমার মন বলছে যে, কোনো মুয়ায্বিনকে হুকুম দিই যেন জামা'আতের ইকামত দেয় এবং আমি কাউকে হুকুম দিই যে, সে আমার স্থানে ইমামতী করুক। আর যারা আযান শুনেও জামা'আতে আসেনি আমি আগুনের কুন্ডলী হাতে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই”। জামা'আত সম্পর্কে নবীজী এত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

জামা'আতে সালাত আদায় করলে কেবল সাওয়াব পাওয়া যায় তাই নয়, সামাজিক শিক্ষাও পাওয়া যায়। যথাসময় সালাত আদায়ের দ্বারা আমরা যখনকার কাজ তখনই করতে হয়, এ শিক্ষা পাই। জামাআতে কাঁধে

কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হয়, এতে আমরা একতার শিক্ষা পাই। সালাতের জন্য পাকপবিত্র হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিকভাবে সালাতের আহকাম আরকান পালন করতে হয়। এতে আমাদের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়। জামাআতে একজন ইমাম থাকেন। ইমাম মানে নেতা। সালাতের প্রতিটি কাজে ইমামকে অনুসরণ করতে হয়। এতে আমরা নেতার প্রতি আনুগত্যের শিক্ষালাভ করতে পারি।

আমরা জামা‘আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব জানলাম এবং নিয়মিত জামা‘আতে সালাত আদায় করব।

সালাতের ফরয

সালাত সহীহ বা সঠিক হওয়ার জন্য এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস আছে যার একটি ছুটে গেলে সালাত হবে না। এগুলো মোট চৌদ্দটি। এগুলোকে সালাতের ফরয বলা হয়। এর মধ্যে সালাতের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আহকাম বা শর্ত বলা হয়। যথা—

| | |
|--|---|
| ১. শরীর পাক হওয়া। | ৫. কিবলামুখী হওয়া অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। |
| ২. পরিধানের কাপড় পাক হওয়া। | |
| ৩. সালাতের স্থান অর্থাৎ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা হবে তা পাক হওয়া। | ৬. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া। |
| ৪. পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাতের কজি ও পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা। | ৭. নিয়্যাত করা অর্থাৎ যে ওয়াক্তের সালাত পড়তে হবে মনে মনে সেই ওয়াক্তের নিয়্যাত করা। |

আর সালাতের ভিতরে সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়। যথা—

| | |
|---|---|
| ১. তাকবীরে তাহরীমা-এর নিয়্যাত করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলা। | ৫. সিজদাহ করা। |
| ২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে এবং বসতে সক্ষম না হলে শয়নাবস্থায় ইশারায় আদায় করতে হবে। | ৬. শেষ বৈঠকে বসা— যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা হয় তাকেই বলা হয় শেষ বৈঠক। |
| ৩. কিরাআত পড়া। | ৭. কোনো কাজের (সালামের) মাধ্যমে সালাত থেকে বের হওয়া। |
| ৪. রুকু করা। | |

সালাতের ওয়াজিব

সালাতের ওয়াজিব বলতে এমন সব জরুরি বিষয় বুঝায় যার মধ্যে ভুলবশত কোনো একটি ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা সালাত শূন্য করতে হয়।

সালাতের ওয়াজিব চৌদ্দটি

| | |
|---|--|
| ১. প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পড়া। | ৮. তাশাহুদ পাঠ করা। |
| ২. সূরা ফাতিহার সাথে কোনো একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা। | ৯. ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়ার স্থলে উচ্চস্বরে এবং চুপে চুপে পড়ার স্থলে চুপে চুপে কিরা'আত পড়া। |
| ৩. রুকু সিজদাহ ও কিরাআতের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। | ১০. বিতর সালাতে দুআ কুনুত পাঠ করা। |
| ৪. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। | ১১. সালাতের মধ্যে সিজদার আয়াত পড়লে তিলাওয়াতে সিজদাহ করা। |
| ৫. সালাতের রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা। | ১২. সিজদার মধ্যে উভয় হাত ও হাঁটু মাটিতে রাখা। |
| ৬. রুকু করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো। | ১৩. দুই ঈদে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা। |
| ৭. প্রথম বৈঠক অর্থাৎ তিন বা চার রাকা'আত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকা'আত পড়ার পর তাশাহুদ পড়ার জন্য বসা। | ১৪. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা। |

সালাতের সুন্নাত

নবী কারীম (স) সালাতের মধ্যে ফরয ওয়াজিব ছাড়াও কিছু আমল করেছেন কিন্তু এগুলো আদায়ের ব্যাপারে ফরয ওয়াজিবের ন্যায় তাকীদ করেননি। এগুলোকে বলা হয় সুন্নাত। যদিও এগুলো ছুটে গেলে সালাত নষ্ট হয় না কিংবা সাহু সিজদাহ দিতে হয় না, তথাপি এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ নবী কারীম (স) এভাবে সালাত আদায় করেছেন এবং অন্যকেও আদায় করতে বলেছেন।

সালাতের সুন্নাত একুশটি

| | |
|--|--|
| ১. তাকবীর তাহরীমা বলার সময় পুরুষের কানের লতি ও স্ত্রীলোকের কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠানো। | ৯. ফরয সালাতের তৃতীয়, চতুর্থ রাকা'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়া। |
| ২. তাকবীর বলার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো খুলে রাখা এবং কিবলামুখী করে রাখা। | ১০. ফাতিহার পর আমীন বলা। |
| ৩. নিয়্যাত করার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। পুরুষের জন্য নাভির উপর এবং স্ত্রীলোকের বুকের উপর হাত রাখা। | ১১. সানা, আউযুবিলাহ, আমীন আস্তে বলা। |
| ৪. তাকবীর তাহরীমা বলার সময় মাথা অবনত না করা। | ১২. কিরাআতে সুন্নাত তরিকা অনুসরণ করা। |
| ৫. ইমামের জোরে তাকবীর বলা। | ১৩. রুকু এবং সিজদায় কমপক্ষে একবার তাসবীহ পড়া। |
| ৬. সানা পড়া। | ১৪. রুকুতে মাথা ও কোমর সোজা রাখা এবং দুই হাতের আঙুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা। |
| ৭. আউযু বিলাহ পড়া। | ১৫. রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও মুক্তাদির 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা। |
| ৮. প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পরে বিসমিল্লাহ পড়া। | ১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সর্বশেষ কপাল মাটিতে রাখা। |

| | |
|--|--|
| ১৭. বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। | ২০. দরূদের পর দুআ মাসূরা বা এই জাতীয় কোনো দুআ পড়া। |
| ১৮. তাশাহুদে “লা-ইলাহা”-এর ‘লা’ উচ্চারণের সময় শাহাদাত আঙুল উঠানো। | ২১. প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফিরানো। |
| ১৯. শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরূদ পড়া। | |

সালাতের মুস্তাহাব

সালাতে এমন কিছু কাজ আছে যা মেনে চললে সাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় না। এগুলোকে বলা হয় মুস্তাহাব। সালাতের কতিপয় মুস্তাহাব নিচে দেওয়া হল—

| | |
|---|---|
| ১. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা। | ৫. সিজদার সময় উভয় হাতের মধ্যস্থানে মাথা রাখা। |
| ২. রুকূর সময় পায়ের ওপর, সিজদার সময় নাকের ওপর এবং বসা অবস্থায় কোলের ওপর দৃষ্টি রাখা। | ৬. মাগরিবের সালাতে ছোট সূরা পাঠ করা। |
| ৩. হাঁচি এলে, হাই উঠলে, কাশি এলে যথাসম্ভব চেপে রাখার চেষ্টা করা। | ৭. একা একা সালাত পড়লে রুকূ, সিজদায় তাসবীহ তিনবারের বেশি পাঁচ, সাত কিংবা তার বেশিবার পড়া। |
| ৪. ধীরস্থিরভাবে কুরআন পাঠ করা। | |

আমরা সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো বলতে পারব এবং গুরুত্বের সাথে পালন করব।

সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণ

সালাতের শুরুতে আমরা নিয়্যাত করে “আল্লাহু আকবার” বলে হাত বাঁধি, একে বলা হয় তাকবীরে তাহরীমা। এই তাকবীর বলার পর অন্য কোনো কাজ করা বা কথা বলা হারাম হয়ে যায়। যদি কেউ এমন কাজ করে ফেলে তবে সালাত বাতিল হবে। এমন কাজ করা গুনাহের কাজ। কী কী কাজ করলে সালাত ভেঙে যায় তা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। সালাত ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণগুলো নিচে দেওয়া হল—

| | |
|--|---|
| ১. সালাতের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে, সালামের উত্তর দিলে। | ৯. কিবলার দিক থেকে মুখ ঘুরালে। |
| ২. সালাতের মধ্যে কথা বললে। | ১০. দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ করলে। |
| ৩. কিছু খেলে। | ১১. মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা সামনে দাঁড়ালে। |
| ৪. কিছু পান করলে। | ১২. নাপাক স্থানে সিজদাহ করলে। |
| ৫. শব্দ করে হাসলে। | ১৩. দুনিয়ার কোনো কিছু প্রার্থনা করলে। |
| ৬. বিপদ বা কষ্টের জন্য উচ্চস্বরে কঁাদলে। | ১৪. বিনা কারণে বারবার কাশি দিলে। |
| ৭. ব্যথা বা রোগের কারণে ‘উহু আহু’ এরূপ শব্দ করলে। | ১৫. সালাতের কোনো ফরয বাদ গেলে। |
| ৮. কুরআন মাজীদ দেখে পড়লে। | ১৬. কোনো সুসংবাদে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললে। |
| | ১৭. কোনো দুঃসংবাদে ‘ইন্না লিল্লাহ’ বললে। |
| | ১৮. হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললে। |

- | | |
|--|--|
| ১৯. হাঁচির উত্তরে ‘ইয়ারহামুকুমুল্লাহ’ বললে। | ২১. আমলে কাসীর (এমন কাজ করা যা দেখলে লোক মনে করবে যে, সে নামায পড়ছে না) করলে। |
| ২০. নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুল ধরলে। | |

সালাত মাকরুহ হওয়ার কারণ

এমন কিছু কাজ আছে যাতে সালাত নফ্য না হলেও সাওয়াব কম হয়, সেগুলোকে মাকরুহ বলে। এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। নিচে এমন কতকগুলো কাজের কথা উল্লেখ করা হল

- | | |
|---|--|
| ১. সালাতে বিনা কারণে আঙুল মটকানো। | ১২. ইশারায় সালাম করা। |
| ২. আলসেমী করে খালি মাথায় সালাত আদায় করা। | ১৩. শুধু কপাল অথবা শুধু নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ করা। |
| ৩. কাপড় ধূলাবালি থেকে বাঁচানোর জন্য গুটিয়ে নেওয়া। | ১৪. বিনা কারণে শুধু ইমামের উঁচুস্থানে দাঁড়ান। |
| ৪. পরনের কাপড়, বোতাম, দাড়ি ইত্যাদি অহেতুক নাড়াচাড়া করা। | ১৫. বিনা কারণে চারজানু হয়ে বসা। |
| ৫. ময়লা ও অশালীন পোশাক পরে সালাত আদায় করা। | ১৬. চোখ বন্ধ করে সালাত আদায় করা। |
| ৬. পেশাব-পায়খানা চেপে রেখে সালাত আদায় করা। | ১৭. কিরাআত পুরা না করেই বুকুর জন্য ঝুঁকে পড়া। |
| ৭. এদিক-ওদিক তাকানো। | ১৮. সালাতের কোনো সুন্নাত বাদ দেওয়া। |
| ৮. সিজদায় দুই হাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া। | ১৯. সিজদার সময় পা মাটি থেকে উঠানো। |
| ৯. ইমামের মেহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো। | ২০. সালাতে আয়াত, তাসবীহ আঙুল দিয়ে গণনা করা। |
| ১০. প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরা। | ২১. কিরাআতে অসুবিধা হয় মুখে এমন কোনো জিনিস রাখা। |
| ১১. আগের কাতারে জায়গা থাকলেও একাকী পিছনে দাঁড়ানো। | |

আমরা সালাত ভঙ্গের ও মাকরুহ হওয়ার কারণগুলো বলতে পারব। এগুলো থেকে সতর্ক থাকব।

সিজদায়ে সাহু

সাহু মানে ভুল। ভুলবশত সালাতে ওয়াজিব তরক হলে তা সংশোধনের জন্য সালাতের শেষ বৈঠকে দুইটি সিজদাহ করা ওয়াজিব। এরই নাম সিজদায়ে সাহু বা ভুল-সংশোধনের সিজদাহ।

সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম

সালাতে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর ডানদিকে সালাম ফিরাব। তারপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সালাতের সিজদার ন্যায় দুই সিজদাহ করে তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ মাসূরা পড়ব। তারপর দুইদিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

যে কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব

| | |
|--|--|
| ১. ভুলে সালাতের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে। | ৪. সালাত আদায়ে ধারাবাহিকতার খেলাফ হলে। |
| ২. সালাতের কাজগুলো পরপর আদায় করতে বিলম্ব করলে। যেমন – ফাতিহা পড়ার পর চুপ করে থাকা। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর কোনো সূরা পড়া। | ৫. কোনো ফরয একবারের স্থলে একাধিকবার করলে। |
| ৩. কোনো ফরয আদায় করতে বিলম্ব হলে। | ৬. কোনো ওয়াজিবের রূপ পরিবর্তন করলে। যেমন – সরবে কিরাআত পড়ার স্থলে নীরবে এবং নীরবে পড়ার স্থলে সরবে পড়া। |

সিজদাহ তিলাওয়াত

পবিত্র কুরআনে এমন কতগুলো আয়াত আছে যা পড়লে বা শুনলে সিজদাহ করা জরুরি হয়ে পড়ে। পুরো আয়াত বা আয়াতের অংশবিশেষ পাঠে, সিজদাহর শব্দটি পড়লে বা শুনলেই সিজদাহ দিতে হবে। সিজদাহ আদায় না করলে গুনাহ হয়। মহানবী (স) বলেন, “যখন কেউ সিজদাহর আয়াত পড়ে সিজদাহ করে তখন শয়তান একপাশে বসে বিলাপ করতে থাকে এবং বলে: হায় আফসোস! আদম-সন্তানদের সিজদাহর হুকুম দেওয়া হল, তারা সিজদাহ করল এবং জান্নাতের হকদার হল। আর আমাকে সিজদাহর হুকুম দেওয়া হলে আমি অস্বীকার করে জাহান্নামী হলাম।” (মুসলিম)

সিজদাহ তিলাওয়াতের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যাত করে “আল্লাহু আকবার” বলে সিজদাহ করতে হয়। সিজদাহ করার পর “আল্লাহু আকবার” বলে উঠে দাঁড়াতে হবে। তাশাহুদ পড়া ও সালাম করার প্রয়োজন নেই। সিজদায়ে তিলাওয়াতে একটি সিজদাহ করলেই চলবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের চারটি শর্ত

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ১. তাহারাত অর্থাৎ পাকপবিত্র হওয়া। | ৩. কিবলার দিকে মুখ করা। |
| ২. সতর ঢাকা। | ৪. সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যাত করা। |

সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ১. সূরা আল-আরাফ ২০৬ আয়াত। | ৮. সূরা আন-নামল ২৫-২৬ আয়াত। |
| ২. সূরা রা'দ ১৫ আয়াত। | ৯. সূরা আলিফ-লাম-মীম-সিজদাহ ১৫ আয়াত। |
| ৩. সূরা আন-নাহল ৪৯-৫০ আয়াত। | ১০. সূরা সাদ ২৪-২৫। |
| ৪. সূরা বনী ইসরাঈল ১০৯ আয়াত। | ১১. সূরা হা-মীম-সিজদাহ ৩৮ আয়াত। |
| ৫. সূরা মারইয়াম ৫৮ আয়াত। | ১২. সূরা আন-নাজাম ৬২ আয়াত। |
| ৬. সূরা আল-হাজ্জ ১৮ আয়াত। | ১৩. সূরা আল-ইনশিকাক ২০-২১ আয়াত। |
| ৭. সূরা আল-ফুরকান ৬০ আয়াত। | ১৪. সূরা আল-আলাক ১৯ আয়াত। |

৭। আলমগীর হোসেনের বন্ধুর উচিত ছিল —

- ক. নিয়্যাত করার আগে ভুল এড়িয়ে যাওয়া খ. নামায শেষে ভুল ধরিয়ে দেওয়া
গ. নিয়্যাতের আগে পুনরায় ওয়ু করতে বলা ঘ. নামায শেষে ওয়ূর নিয়ম শিখতে বলা

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। হাবীবুর রহমানের দাদা শেষ বয়সে নিয়মিতভাবে নামায পড়া শুরু করেছেন। একদিন মসজিদে ওয়ূ ও গোসলের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা শুনার পর বুঝতে পারলেন, তার জীবনের ফরয গোসল একটিও আদায় হয়নি। তাই তিনি ভাবতে থাকেন যে, তার কোনো নামাযই তো আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। এ কারণে তিনি আখেরাতের ভয়ে কাঁদতে থাকেন।
ক. ওয়ূর ফরয কয়টি?
খ. গোসলের নিয়ম বর্ণনা কর।
গ. হাবীবুর রহমানের দাদা কীভাবে ফরয গোসল করবে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ‘নামায আদায়ের লক্ষ্যে গোসলের পরপরই ওয়ূ করার প্রয়োজন নেই।’ উক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা কর।
- ২। তাহমিনা স্কুল থেকে ফিরে দেখে তার মা প্রায়ই বিকালবেলা সালাত আদায় করে। তা দেখে তাহমিনা তার মাকে জিজ্ঞাসা করে, “মা, তুমি এখন কোন সালাত আদায় করছ?” মা বলল, “যুহুরের সালাত।” তাহমিনা বলল, “এখন তো যুহুরের ওয়াক্তই শেষ।” মা বলল, দেখতেই তো পারছ, কাজকর্মে দেরি হয়ে যায়। আল্লাহ নিশ্চয় মাফ করবেন। তাহমিনা বলল, “মা তোমার এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কয়েম করা মুমিনের ফরয’। পুরুষরা জামা’আতে সালাত আদায় করলে পুরস্কার পায়।
ক. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া কী?
খ. যুহুরের সালাতের সময়সূচি বর্ণনা কর।
গ. তাহমিনার মাকে সঠিক সময়ে সালাত আদায়ে সহায়তা করতে পারে এমন একটি সময়সূচির চার্ট তৈরি কর।
ঘ. “নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কয়েম করা মুমিনের ফরয”—আয়াতটি বিশ্লেষণ কর।
- ৩। ফয়সাল নিয়মিত সালাত আদায় করে কিন্তু সব রোযা রাখে না। ফাহিম রোযা রাখে এবং সালাত আদায় করে। অপর বন্ধু সাজ্জাদ এ প্রসঙ্গে ফয়সাল ও ফাহিমকে বলল—শুধু কি সালাত, রোযা ও হাজ্জই আমাদের ইবাদাতের বিষয়? আমি ইমাম সাহেবের খুতবায় শুনেছি আমাদের জীবনের চব্বিশ ঘণ্টাই ইবাদাত হতে হবে। তবে সর্বোত্তম ইবাদাত আদায়ের শর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। আল্লাহর রাসূল বলেন, “পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।”
ক. ইবাদাত শব্দের অর্থ কী?
খ. সাজ্জাদ ইবাদাত বলতে কী বুঝিয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. ফয়সাল কীভাবে তার জীবনকে ইবাদাতের মধ্যে কাটাতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. “পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।”—হাদীসটির তাৎপর্য লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা

কুরআন মাজীদ

পরিচয়

কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর বাণী। আল-কুরআন কোনো মানুষের কথা নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য কুরআন মাজীদ নাখিল করেছেন। মানুষ কোন পথে চললে দুনিয়াতে শান্তি পাবে, আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতের পরম সুখ-শান্তি লাভ করবে, তা আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এসব বাণীর সমষ্টিই কুরআন মাজীদ।

কুরআন মাজীদ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ

নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে হযরত মুহাম্মাদ (স) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানে তাঁর নিকট আল্লাহ তাআলার বাণী নিয়ে উপস্থিত হন। এসময় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত তাঁর ওপর নাখিল করেন। এরপর থেকে প্রয়োজন অনুসারে জিবরাঈল (আ) কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ নিয়ে নবী কারীম (স)-এর নিকট আসতেন। এভাবে মহানবী (স)-এর দীর্ঘ তেইশ বছর নবুওয়্যাতকালে পবিত্র কুরআনের অবতরণ সম্পন্ন হয়।

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের নিকট তাঁর কিতাব প্রেরণ করেন। আসমানী কিতাবের সর্বমোট সংখ্যা ১০৪ খানা। এ সকল কিতাবের মধ্যে বড় বড় কিতাব হল চারটি—তাওরাত, যাবুর, ইনজীল এবং আল-কুরআন।

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। তাই তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাবই সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এতে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের মূল ও সারকথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূল এবং তাঁদের উম্মাতদের বর্ণনাও আছে। যে সকল জাতি নবীগণের বিরোধিতা এবং আল্লাহর হুকম অমান্য করেছে তাদের শাস্তির কথাও কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে যত নবী পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলকে এমন কিছু মু'জিয়া (অলৌকিক বস্তু) দিয়েছিলেন যা দেখে লোকেরা তাঁদের প্রতি ঈমান আনে।

আমাদের নবীর সবচেয়ে বড় মু'জিয়া কুরআন মাজীদ। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তাঁর ইস্তিকাল হয়েছে, কিন্তু কুরআন মাজীদ আজও ঠিক তেমনি আছে যেমনটি তাঁর সময় ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপ থাকবে।

কুরআন মাজীদ শিক্ষা

কুরআন মাজীদ সকলপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভান্ডার। এটি মানবজাতির দিশারী। সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। দুনিয়ায় মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে তার নির্দেশনা কুরআন মাজীদে আছে। কাজেই কুরআন মাজীদ শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলাত

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা। কুরআন মাজীদ আমাদের পবিত্র গ্রন্থ, এর তিলাওয়াত একটি পবিত্র কাজ। কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতি হরফে (অক্ষর) দশটি করে নেকী পাওয়া যায়। যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। তিলাওয়াতকারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট থাকেন।

কুরআন মাজীদের আয়াত বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা উত্তম। বুঝে পাঠ করলে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জানা যাবে এবং তিলাওয়াতের হক আদায় হবে। আমাদের প্রিয় নবী (স) কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতকে অতি উত্তম ইবাদাত বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে আমাদের মাঝে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান এবং কুরআনের শিক্ষা দেন। রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ কুরআন মাজীদ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন।

এ পাঠ থেকে আমরা জানতে পারলাম, কুরআন মাজীদের পরিচয়, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলাত সম্বন্ধে। কাজেই আমরা সব সময় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করব এবং তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করব।

তাজবীদ

কুরআন মাজীদের প্রতিটি হরফ মাখরাজ এবং সিফাত অনুসারে পড়ার নাম তাজবীদ। মাখরাজ অর্থ বের হওয়ার স্থান। আর সিফাত অর্থ আরবি উচ্চারণের বিশেষ অবস্থা। কোনো কোনো আরবি বর্ণকে উচ্চারণ করার সময় মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়, যেমন ط (ত্বয়া)। আবার কোনো কোনো বর্ণকে চিকন বা সরু করে উচ্চারণ করতে হয়, যেমন (তা) ت। ط এবং ت-এর উচ্চারণ স্থান এক ও অভিন্ন। কিন্তু উচ্চারণে ط-কে মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। বর্ণের উচ্চারণের এ বিশেষ অবস্থার নাম সিফাত। তাজবীদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তাজবীদ অনুসারে কুরআন না পড়লে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং সালাত শূন্য হবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেছেন—

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

অর্থ : “তোমরা কুরআন থেমে থেমে পড়ো।”

বিশুদ্ধভাবে থেমে পড়াকে তারতীল বলা হয়। শূন্য করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা অনেক বেশি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ-

অর্থ : “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।”

ভোরবেলায় মনোযোগসহ কুরআনের একটি আয়াত পড়তে শেখা অনেক মূল্যবান সম্পদের চেয়েও উত্তম।

মাখরাজ

আরবি ভাষায় সর্বমোট ২৯টি হরফ বা বর্ণ আছে। এ হরফগুলো মুখের ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এ উচ্চারণ স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। মাখরাজগুলো মুখের ৫টি স্থানে অবস্থিত।

| | |
|-------------------|------------------------------|
| ১. হলক (কণ্ঠনালি) | ৪. নাসিকামূল এবং |
| ২. জিহ্বা | ৫. জাওফ (মুখের খালি জায়গা)। |
| ৩. উভয় ঠোঁট | |

মাখরাজের বিস্তারিত বিবরণ

১. প্রথম মাখরাজ মুখের খালিস্থান। এ স্থান থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়।

- (ক) জযমবিশিষ্ট ۉ যথা- اُ
- (খ) জযমবিশিষ্ট ۏ যথা- اِ
- (গ) হরকত বিহীন আলিফ যখন এর ডান পাশের হরফে যবর থাকে। যথা- مَ

উল্লিখিত এ তিনটি হরফ উচ্চারণের সময় মুখ, হলক বা জিহ্বা কোনো স্থানে লাগে না। বরং মুখের মাঝখানে সৃষ্ট বাতাসের ওপর উচ্চারিত হয়। এগুলোকে হরফে মাদ বা মাদবিশিষ্ট অক্ষরও বলা হয়।

২. কণ্ঠের নিম্নাংশ থেকে উচ্চারিত হয় ۞ - ۝ হামযা ও হা। যথা- اُ - اِ
৩. কণ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান থেকে উচ্চারিত হয় ۡ - ۢ যথা- اَ - اِ
৪. কণ্ঠের উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয় ۣ - ۤ যথা- اَ - اِ একত্রে এ ছয়টি হরফকে হরফে হালকী বা কণ্ঠবর্ণ বলা হয়।
৫. জিহ্বার গোড়া ও তার বরাবর ওপরের তালু থেকে উচ্চারিত হয় ۥ । যথা- اُق
৬. জিহ্বার গোড়ার কিঞ্চিৎ উপরিভাগ এবং তার বরাবর ওপরের তালু সংযোগে উচ্চারিত হয় ۦ । যথা- اُك
৭. জিহ্বার মধ্যভাগ তার বরাবর ওপরের তালু সংযোগে উচ্চারিত হয় ۧ.ش.ی । যথা- اُش - اُی
৮. জিহ্বার পাশ ও ওপরের মাড়ির দাঁতের সংযোগে উচ্চারিত হয় ۨ । যথা- اُض
৯. জিহ্বার অগ্রভাগের পাশ সম্মুখের দাঁতের গোড়ার দিকের তালুর সাথে লেগে উচ্চারিত হয় ۩ । যথা- اُل
১০. জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সে সোজা ওপরের তালু থেকে উচ্চারিত হয় ۪ । যথা- اُن
১১. জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তালুর সাথে লেগে উচ্চারিত হয় ۫ । যথা- اُنْ
১২. জিহ্বার অগ্রভাগ সম্মুখের ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে উচ্চারিত হয় ط.د.ت যথা- اُط - اُد - اُت
১৩. জিহ্বার অগ্রভাগে সামনের নিচের দুই দাঁতের মাথা এবং ওপরের দাঁতের কিঞ্চিৎ সহযোগিতায় উচ্চারিত হয়। ওপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লেগে উচ্চারিত হয় ۬.س.ن যথা- اُس - اُنْ - اُنْ
১৪. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের ওপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লেগে উচ্চারিত হয় ۭ.ظ.ذ.ث যথা- اُظ - اُذ - اُث
১৫. নিচের ঠোঁটের ভেজা অংশ সামনের ওপরের দুই দাঁতের সাথে লেগে উচ্চারিত হয় ۮ.ف যথা- اُف

১৬. নিচের ঠোট থেকে উচ্চারিত হয় **و . ب . م**। ঠোটের ভিজা অংশ থেকে উচ্চারিত হয় **ب**। ঠোটের শূক্ষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয় **م**। উভয় ঠোটের ডান ও বাম পাশ গোল হয়ে অর্ধফোটা ফুলের ন্যায় মধ্যস্থলে গোলাকার ছিদ্র ধারণ করে উচ্চারিত হয় **و**। যথা- **أَوْ - أَب - أُم**।
১৭. নাসিকামূল থেকে গুনাহ উচ্চারিত হয়। নূন জযম বিশিষ্ট হলে কখনও কখনও এ নূনকে নাসিকামূলে গোপন করার উদ্দেশ্যে গুনাহ করতে হয়। যেমন- **مِنْ سَجِيلٍ**।

আরবি হরফ নিজের মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা অত্যাবশ্যিক। আরবি কোনো অক্ষরকে যদি নিজের মাখরাজ থেকে উচ্চারণ না করে অন্য মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা হয় তবে এতে শব্দের অর্থ ঠিক থাকে না। ফলে কখনও কখনও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে যায়। যেমন **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** - ‘বলো আল্লাহ এক’। এখানে **قُلْ** অর্থ বলো। এখন যদি **قُلْ** এর **ق** -কে তার নিজস্ব মাখরাজ থেকে উচ্চারণ না করে **ك** -এর মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে **كُلْ** “ভক্ষণ কর”। ফলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বিগড়ে যাবে।

আমরা অতি যত্ন সহকারে আরবি হরফগুলোর মাখরাজ মশুক বা অনুশীলন করে ঠিক করে নেব।

নাযিরা তিলাওয়াত

কুরআন মাজীদ দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়। কুরআন মাজীদ দেখে পড়া উত্তম। যারা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ তাঁদের জন্য সুপারিশ করবে। এ পাঠে আমরা শূন্যভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে সক্ষম হব এবং নিয়মিত কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করব।

সূরা আল-ফাতিহা (سُورَةُ الْفَاتِحَةِ)

সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আয়াত সংখ্যা সাতটি। সূরা আল-ফাতিহা কুরআন মাজীদের প্রথম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরা দ্বারাই কুরআন মাজীদ আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত সালাত আরম্ভ হয়। এ সূরা কুরআন মাজীদের ভূমিকাস্বরূপ। তাই এর নাম সূরা আল-ফাতিহা রাখা হয়েছে। ফাতিহা অর্থ ভূমিকা। অবতরণের দিক থেকেও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটি প্রথম নাযিল হয়। সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনের সার-সংক্ষেপ। তাই একে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের মূল বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ সূরা উম্মুল কিতাব বা কিতাবের মূল।

শব্দার্থ

| | | | |
|---------------|------------------------------|-------------|------------------|
| الْحَمْدُ - | যাবতীয় প্রশংসা। | إِهْدِنَا - | আমাদের পথ দেখাও। |
| رَبِّ - | প্রতিপালক। | صِرَاطُ - | পথ, রাস্তা। |
| نَعْبُدُ - | আমরা ইবাদাত করি, দাসত্ব করি। | مَغْضُوبٌ - | অভিশপ্ত। |
| إِيَّاكَ - | শুধু তোমরাই। | ضَالِّينَ - | পথভ্রষ্ট। |
| نَسْتَعِينُ - | আমরা সাহায্য চাই। | | |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা।

○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

২. যিনি পরম দয়ালু, অসীম দয়াময়।

○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক।

○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

○ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○

৫. আমাদের সরল পথ দেখাও।

○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○

৬. সে সমস্ত লোকের পথ
যাদের প্রতি ভবিষ্যৎ অনুগ্রহ করেছ।

○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

৭. যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়।

ব্যাখ্যা

সূরা ফাতিহায় সমগ্র কুরআনের সারমর্ম সর্বাঙ্গীভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সঠিক মুনাজাত ও দরখাস্তের বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ রয়েছে। প্রথমত আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ তিনি হলেন সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। বিচার দিবসের মালিক। কাজেই যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

আমরা কেবল সেই মহান আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। তাঁর কাছে আমাদের মুনাজাত: হে আল্লাহ তাআলা! তুমি আমাদের সরল সঠিক পথে অর্থাৎ ইসলামের পথে পরিচালিত কর। যে পথে তোমার প্রিয় বান্দারা অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ ছিলেন এবং মুমিন বান্দাগণ রয়েছেন। ভ্রান্তপথ থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর, যে পথে অভিশপ্তরা রয়েছে। যেমন ইয়াহুদী, নাসারা ইত্যাদি জাতি। আমীন! কবুল কর, হে রাব্বুল আলামীন।

سُورَةُ النَّاسِ (سُورَةُ النَّاسِ)

সূরা নাস মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সূরা নাস কুরআন মাজীদে সর্বশেষ সূরা। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দা সহজ সরল পথের সম্প্রদান চেয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের এ পথের দিশারী হিসেবে কুরআন মাজীদ দান করেছেন। কুরআনের পথে চলার ক্ষেত্রে মানুষের কিছু বাধার সৃষ্টি হয়। এ বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান। এ সূরায় এ দুই প্রকার কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তানের ধোঁকা থেকে রাব্বুল আলামীনের নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

শব্দার্থ

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|---|-----------------|
| إِلَهُ | — | মাবুদ। | أَعُوذُ | — | আমি আশ্রয় চাই। |
| الْوَشَوَاسُ | — | কুমন্ত্রণা। | بِ | — | দ্বারা, সাথে। |
| الْخَنَاسُ | — | কুমন্ত্রণাদাতা। | رَبِّ | — | প্রতিপালক। |
| صُدُورٌ | — | অন্তরসমূহ। | النَّاسُ | — | মানুষ। |
| الْجَنَّةُ | — | জিন। | مَلِكٌ | — | অধিপতি। |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

مَلِكِ النَّاسِ ○ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○

১. বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে। ২. মানুষের অধিপতির কাছে।

إِلَهُ النَّاسِ ○

৩. মানুষের মাবুদের কাছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○

৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে।

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ○

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরসমূহে।

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ○

৬. জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ব্যাখ্যা

সূরা নাসে সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। সমস্ত বিপদাপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রক্ষা করতে পারেন। কেননা তিনি মানুষের পালনকর্তা, অধিপতি এবং মাবুদ। এ সূরায় আল্লাহ তাআলার এ তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করে তাঁর নিকট মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

শয়তান মানুষের পরম শত্রু। সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করে। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া শয়তানের কুচক্র থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে অভিশপ্ত শয়তান ও মানুষের ধোঁকা থেকে রক্ষা কর।

সূরা আন্-ফালাক (سُورَةُ الْفَلَقِ)

সূরা আন্-ফালাক মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সূরা আন্-ফালাক এবং সূরা নাসের পরস্পর সম্পর্ক গভীর। সূরা ফালাকে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দুনিয়ার সকল বস্তুই আল্লাহ তাআলার অধীন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারও অণু-পরিমাণ উপকার অথবা অপকার করতে পারে না এবং আল্লাহ সবকিছুর অপকার থেকে রক্ষা করতে পারেন। এ কারণে যাবতীয় বস্তুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকটই আশ্রয় কামনা করতে হবে।

শব্দার্থ

| | |
|--|--|
| فَلَقٌ — প্রভাত। | وَقَبٌ — অশ্বকারে আচ্ছন্ন হল; অশ্বকার গভীর হল। |
| مِنْ — থেকে। | نَفَثَتْ — ফুৎকারকারীগণ। |
| خَلَقَ — সৃষ্টি করেছেন। | عُقَدٌ — গ্রন্থিসমূহ, গিরাসমূহ। |
| غَاسِقٌ — অশ্বকারে আচ্ছন্নকারী রাত্রি। | حَاسِدٌ — হিংসুক। |
| إِذَا — যখন। | حَسَدَ — হিংসা করল। |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

১. বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার পালনকর্তার।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, এর অনিষ্ট থেকে

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

৩. অশ্বকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর অশ্বকারে আচ্ছন্ন হয়।

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

৪. এবং সে-সকল নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

৫. আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা

সূরা ফালাক-এর প্রথম আয়াতে প্রভাতের রবের নিকট আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। প্রভাতে আল্লাহ যেভাবে রাতের অশ্বকার দূর করে উষার আলো উদ্ভাসিত করেন, সেভাবে তিনি আমাদের জীবনের যাবতীয় বিপদের অশ্বকার দূর করে মুক্তি ও শান্তি দান করেন এবং সকল বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করেন। দ্বিতীয় আয়াতে স্রষ্টার নিকট সকল অনিষ্টসাধনকারী বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

পরবর্তী তিনটি আয়াতে বিশেষ তিনটি বিপদের উল্লেখ রয়েছে। এসব বিপদ থেকে আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই আশ্রয় চাইতে পারি। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। জীবনের যেকোনো বিপদ-আপদে তাঁকেই আমাদের স্মরণ করতে হবে। তিনি সকলপ্রকার অনিষ্ট থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন।

সূরা আল-আসর (سُورَةُ الْعَصْرِ)

সূরা আল-আসর মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আয়াত সংখ্যা তিন। এ সূরা কুরআন মাজীদে একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এ সূরার অর্থ অতি ব্যাপক। ইমাম শাফিঈ (র) এ সূরা সম্পর্কে বলেছেন, “এ সূরাটি চিন্তা সহকারে পাঠ করলে মানুষের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হবে।” মানুষের কল্যাণের পথ কোনটি এবং তাদের ধ্বংসের পথ কোনটি, এ সূরায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

আমরা এ সূরাটি মুখস্থ করব এবং এর অর্থ শিখব।

শব্দার্থ

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|
| وَالْعَصْرِ — | সময়ের শপথ। | إِنَّ — | অবশ্যই। |
| فِي — | মধ্যে। | خُسْرٌ — | ক্ষতি। |
| الَّذِينَ — | যারা। | أَمَنُوا — | ঈমান এনেছে। |
| الصَّالِحَاتِ — | সৎ কর্মাবলি। | تَوَاصَوْا — | পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে। |
| الصَّبْرِ — | ধৈর্য। | الْإِنْسَانُ — | মানুষ। |
| إِلَّا — | তবে। | عَمِلُوا — | কাজ করেছে। |
| | | الْحَقُّ — | সত্য। |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعَصْرِ

১. সময়ের শপথ।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

৩. কিন্তু তারানয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ

৪. আর পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

ব্যাখ্যা

সূরা আসরে আল্লাহ তাআলা যুগের কসম করে বলেছেন, মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে যারা নিষ্ঠার সাথে চারটি কাজ করে কেবল তারাই ক্ষতি থেকে মুক্তি পাবে। এ চারটি কাজ হচ্ছে “ঈমান, সৎকর্ম, একে অপরকে সত্যের উপদেশ এবং ধৈর্যের উপদেশ দান”। সময় ও কাল মানবজীবনের অতি মূল্যবান বস্তু। সময়ের সঠিক ব্যবহার করলে ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করা যায়। এ মহামূল্যবান সময়ের কসম করে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করেছেন।

চারটি সৎকাজের মধ্যে প্রথম দুইটি কাজ আত্মসংশোধনমূলক। এ দুইটির প্রথমটি হল ঈমান। আল্লাহকে এক, অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল বলে স্বীকার করার নাম ঈমান। ঈমানের পর নেক-কাজ মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে। নেক আমল ব্যতীত শুধু ঈমান মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারে না।

পরবর্তী দুইটি সামাজিক কাজ। সমাজে কোনো অন্যায় হতে দেখলে সেখানে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা যাবে না। অন্যায়কারীকে বুঝাতে হবে, ভালো কাজের পরামর্শ দিতে হবে। শুধু নিজে সৎকাজ করলে মুক্তি পাওয়া যাবে না। নিজের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে ভালোমানুষ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এ চেষ্টা করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলে থেমে যাওয়া ঠিক নয়, বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে। একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতে হবে।

সূরা আল-হুমাযাহ (سُورَةُ الْهُمَزَةِ)

সূরা হুমাযাহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সূরা হুমাযাতে মানুষের কয়েকটি ঘৃণ্য স্বভাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ খারাপ অভ্যাসগুলো থাকে সে সমাজে ঘৃণিত। এ ধরনের ব্যক্তি পরকালে কঠিন শাস্তি পাবে।

শব্দার্থ

| | |
|---|---|
| وَيْلٌ — দুর্ভোগ। | لَيُنْبَذَنَّ — সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে। |
| كُلٌّ — প্রত্যেক। | الْحُطَمَةُ — চূর্ণ-বিচূর্ণকারী, একটি জাহান্নামের নাম হুতামা। |
| هُمَزَةٌ — নিন্দুক। | نَارٌ — আগুন। |
| لَمَرَةٌ — সম্মুখে নিন্দাকারী। | الْمُوقَدَةُ — প্রজ্বলিত। |
| جَمَعَ — সঞ্চিত করেছে, জমা করেছে। | تَطَّلِعُ — গ্রাস করবে। |
| مَالًا — ধন, সম্পদ। | أَفِيدَةً — হৃদয়, অন্তঃকরণ। |
| عَدَدَهُ — তা গণনা করেছে। | مُؤَصَّدَةً — পরিবেষ্টিত। |
| يَحْسَبُ — সে ধারণা করে। | عَمْدٌ — স্তম্ভ। |
| أَخْلَدَهُ — তাকে চিরকাল রাখবে, অমর করবে। | مُمَدَّدَةً — দীর্ঘায়িত। |
| كَأَلًا — কখনও না। | |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

২. যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে।

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

৩. যে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।

وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحُطَمَةُ

৫. আপনি কি জানেন হুতামা কী?

نَارُ اللَّهِ الْمُوَقَّدَةُ

৬. এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি।

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

৭. যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ

৮. নিশ্চয়ই এটি তাদের পরিবেষ্টিত করে রাখবে।

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

ব্যাখ্যা

সূরা হুমাযায় মানবসমাজের কতিপয় লোকের দুইটি মারাত্মক নৈতিক দোষ ও তাদের অর্থলিপ্সার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ছয়টি আয়াতে এসব কাজের মারাত্মক পরিণামের উল্লেখ আছে। প্রথম দোষটি হল গীবত বা পরনিন্দা। গীবত করা হারাম এবং এতে কবীরা গুনাহ হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে গীবত করাকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় দোষটি হল, কারও সামনে তার নিন্দা করা। এটিও জঘন্য কাজ। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত করা হয়। সে তখন এর প্রতিরোধ করে এবং এতে ঝগড়াঝাঁটি ও ফেতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় দোষটি হচ্ছে, অর্থলিপ্সা। অর্থ অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়। অর্থলোভী ব্যক্তি পরের হক আদায় করে না। গরিব-দুঃখীর পাওনা দেয় না। কৃপণতার কারণে সে বারবার অর্থের হিসাব করতে থাকে। আর ধারণা করে এ অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। তার এ ধারণা একেবারেই অমূলক। যে-সকল লোকের মধ্যে এ দোষগুলো থাকবে আখিরাতে তাদের পরিণাম হবে করুণ। তাদেরকে ‘হুতামা’ নামক অতি গভীর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা চূর্ণবিচূর্ণ হবে, কঠিন অগ্নিতে প্রজ্বলিত হবে। এ শাস্তি শেষ হবে না। কাজেই আমরা গীবত (পরনিন্দা) ও কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকব।

মুনাজাতমূলক তিনটি আয়াত

আল্লাহ আমাদের রব। আমাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অসীম। তিনি আমাদের যে-সকল নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহর দয়া ছাড়া আমরা তা সঠিকভাবে পালন করতে পারি না। এজন্যই তাঁর নিকট আমাদের মুনাজাত করতে হয়। আমরা বহু দোষত্রুটি করে থাকি, এ কারণে আমরা অপরাধী এবং শাস্তির যোগ্য। আখিরাতে শাস্তি থেকে মুক্তি এবং দুনিয়াতে ভালো কাজ করার ক্ষমতা দানের জন্য সদাসর্বদা মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের মুনাজাত করা প্রয়োজন।

নিম্নের মুনাজাতমূলক আয়াতগুলো মুখস্থ করব এবং অর্থ শিখব।

এক

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

(বাকারা : ২০১)

আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিসে আমাদের কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ, এটা তিনিই ভালো জানেন। এ কারণে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আমরা তাঁরই নিকট মুনাজাত করব। আর জাহান্নামের শাস্তি বড়ই কঠিন। এ শাস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য তাঁরই নিকট আমরা প্রার্থনা জানাব।

দুই

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

অর্থ : হে প্রতিপালক! তুমি তাঁদের প্রতি তেমনি সদয় হও, যেমনিভাবে তাঁরা (আদর-যত্নে) শৈশবে আমাকে লালনপালন করেছেন। (বনী ইসরাঈল : ২৪)

সূরা বনী ইসরাঈলের এ আয়াতে পিতামাতার জন্য আল্লাহপাকের নিকট মুনাজাত করার জন্য বলা হয়েছে। পিতামাতার জন্য আমরা কী দুআ করব, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আমাদের তা শিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ আয়াতটি মুখস্থ করে এ আয়াতের দ্বারা পিতামাতার কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করব।

তিন

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

অর্থ : হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (ত্বাহা : ২৫-২৮)

আমরা লেখাপড়া শিখব। জীবনে উন্নতি লাভ করব। মানবকল্যাণে সচেষ্ট হব। যাতে আমরা এ কাজগুলো সহজে করতে পারি এজন্য আমাদের অন্তর প্রসারিত তথা জ্ঞানবুদ্ধিকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত করব।

হাদীস শরীফ

হাদীস অর্থ কথা বা বাণী। মহানবী (স)-এর কথা, কাজ এবং মৌনসম্মতিকে হাদীস বলা হয়। হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ তাআলার রাসূল। তিনি জীবনে যত কথা বলেছেন তা-ই হাদীস। তিনি উম্মাতকে কখনও কোনো কাজ করার আদেশ করেছেন। আবার কখনও কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর এসব আদেশ-নিষেধ আল্লাহর হুকুম মতোই হত। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে যে কাজ করতেন তা উম্মাতের জন্য আদর্শ।

সাহাবীগণ নবী কারীম (স) এর হাদীস সংরক্ষণ করতেন। তাঁরা কথা শুনার জন্য তাঁর পাশে থাকতেন। তিনি মজলিস থেকে উঠে চলে গেলে সাহাবীগণ পরস্পর তাঁর হাদীস আলোচনা করতেন এবং তা কণ্ঠস্থ করতেন। তখন হাদীস লেখা নিষেধ ছিল। কারণ তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল। আর হাদীস লিখলে তা কুরআনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস নিজেদের স্মৃতিপটে অঙ্কন করে রাখতেন এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ নিজেদের শিশুসন্তানদের যেমন কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআন শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠাতেন, অনুরূপভাবে হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের হাদীস শিক্ষার জন্য প্রেরণ করতেন।

সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) তাঁর বাল্যকালের হাদীস মুখস্থ করার বর্ণনা দিয়ে বলেন, “রাসূল (স)-এর যামানায় আমি বালক ছিলাম এবং তখন আমি রাসূল (স)-এর হাদীস মুখস্থ করতাম।” (মুসলিম শরীফ)

পরবর্তী যুগেও বাল্যকালে হাদীস মুখস্থ করার এ রীতি চালু ছিল। কাজেই আমরাও হাদীস মুখস্থ করার চেষ্টা করব।

কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান

ইসলামে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীস ব্যতীত ইসলামী জীবনব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে কুরআনের ব্যাখ্যা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই হাদীস। সালাত কীভাবে পড়তে হবে, এ বর্ণনা আমরা হাদীসে পাই। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, “তোমরা আমাকে যে নিয়মে সালাত পড়তে দেখো সে নিয়মেই সালাত আদায় কর।” ইমাম আবু হানীফা (র) এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, “সুন্নাত বা হাদীস না থাকলে আমরা কেউই কুরআন বুঝতে পারতাম না।” আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁর হাদীসের জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যিক। যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর হাদীস শুনে সতর্কতা করবে এবং অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ধন্য করবেন।

আমরা মহানবী (স)-এর হাদীস আগ্রহের সাথে পাঠ করব এবং তা বুঝতে চেষ্টা করব।

নীতিমূলক হাদীস

জীবন ও সমাজকে সুন্দর করার জন্য উত্তম নীতির অনুসরণ অপরিহার্য। আদর্শ নীতি ও চরিত্রের অনুকরণ ছাড়া ব্যক্তি ও জাতির কখনও উন্নতি হতে পারে না। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। আদর্শ নীতির জন্য তিনি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। আমরা যাতে উত্তম নীতির অধিকারী হতে পারি এ সম্পর্কে তাঁর অনেক হাদীস আছে। নিচে দুইটি নীতিমূলক হাদীস উল্লেখ করা হল—

এক

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (مسند ديلمی) —

অর্থ : “যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না সে পরিপূর্ণ দীনদার নয়” (মুসনাদ-ই-দায়লামী)।

শিক্ষা

অজ্ঞীকার পূর্ণ করা অত্যাবশ্যিক। সৃষ্টির সূচনাকালে সকল মানুষ আল্লাহ তাআলাকে রব মেনে নেয়ার অজ্ঞীকার করেছে। এ অজ্ঞীকার অনুসারে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়া আমাদের কর্তব্য। কেয়ামতের দিন এ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। দুনিয়াতে যেসব ওয়াদা করা হয় সেগুলোও পালন করতে হবে। পরস্পরের লেনদেন কথা কাজ ইত্যাদি ব্যাপারেও যে অজ্ঞীকার করা হয় তাও আমাদের পূরণ করতে হবে। সমাজে এ নীতি প্রতিপালিত হলে সমাজের অশান্তি অনেকাংশে দূর হয়ে যাবে। আমরা সর্বদা অজ্ঞীকার রক্ষা করব।

দুই

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ —

অর্থ : “পাক পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।” (মুসলিম)

শিক্ষা

পবিত্রতার কয়েকটি স্তর আছে। যথা—শরীরকে নাপাক থেকে পবিত্র করা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সকলপ্রকার পাপ কাজ থেকে পবিত্র রাখা। কুচিন্তা থেকে অন্তর পবিত্র রাখা। ঈমান মানুষকে ছোট বড় পাপ থেকে পবিত্র রাখে। ওযু, গোসল এবং বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা মানুষের শরীরকে পবিত্র করে। শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, বিদ্যালয় ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন থাকলে মানুষের অন্তরও প্রফুল্ল থাকে।

আমরা সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব এবং আমাদের পরিবেশকেও পরিষ্কার রাখব।

মুনাজাতমূলক হাদীস

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন অতি দয়ালু। উম্মতের কষ্টে তিনি মনে ব্যথা পেতেন, অন্তরে দুঃখ অনুভব করতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি আমাদের মুনাজাতমূলক অনেক হাদীস শিখিয়েছেন যাতে আমরা ঐ হাদীসগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার দরবারে মুনাজাত করি। আমরা প্রিয় নবীর মুনাজাতমূলক দুইটি হাদীসের অর্থ শিখব, মুখস্থ করব এবং মুনাজাতে তা ব্যবহার করব।

এক

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي —

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও।” (তাবরানী)

দুই

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا حَلَالًا —

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী বিদ্যা এবং হালাল রিযিক চাই।”

আমরা হাদীসের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব। নীতিমূলক ও মুনাজাতমূলক হাদীসগুলো শুদ্ধভাবে পড়তে পারব। এগুলো অর্থসহ মুখস্থ বলতে পারব এবং মুনাজাতে ব্যবহার করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। পবিত্র কুরআনের কোন সূরার আয়াত প্রথম নাযিল হয়?

| | |
|-------------------|--------------|
| ক. সূরা আল-ফাতিহা | খ. সূরা নাস |
| গ. সূরা ফালাক | ঘ. সূরা আলাক |
- ২। কণ্ঠনালীর শেষ অংশ থেকে কোন কোন হরফ উচ্চারিত হয়?

| | |
|----------|----------|
| ক. ۵ . ۶ | খ. ج . ش |
| গ. ح . ع | ঘ. ا . ق |
- ৩। ইসলামে মর্যাদার দিক থেকে পবিত্র কুরআনের পরেই কোনটির অবস্থান?

| | |
|-----------|--------------|
| ক. হাদীস | খ. ইজমা |
| গ. কিয়াস | ঘ. মুসতাহসান |

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সফিকুল ইসলাম দিনমজুরি করে খুব কষ্টের মধ্যে সংসার চালায়। সে অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে।

- ৪। সফিকুল ইসলাম কাজের পাশাপাশি-

| | |
|-----------------------------------|---|
| ক. আত্মীয়স্বজনের নিকট টাকা চাইবে | খ. হালাল রিযিকের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করবে |
| গ. সরকারের কাছে সাহায্য চাইবে | ঘ. অর্থপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করবে |
- ৫। সফিকুল ইসলাম-

| | |
|------------------------------|--|
| ক. নিজের ভাষায় মুনাজাত করবে | খ. কুরআন ও হাদীসের ভাষা ব্যবহার করে মুনাজাত করবে |
| গ. কেবল কাজই করে যাবে | ঘ. যারা ভালো বুঝে তাদের পরামর্শ নিবে |

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুনীর শৈশবে একজন ভালো কারীর নিকট থেকে শুম্ভভাবে মাখরাজসহ তিলাওয়াত শিখেছে এবং তার বড়ভাই একজন বড় আলেমের কাছে অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কুরআন শিখছে।

৬। শুম্ভভাবে কুরআন তিলাওয়াত বলতে বুঝায়—

- মাখরাজসহ
- তাজবিদের নিয়মসহ
- অর্থসহ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৭। অর্থসহ কুরআন পড়লে—

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ক. জ্ঞানলাভ হয় | খ. ইমামতি করা যায় |
| গ. অর্থ উপার্জন করা যায় | ঘ. সহীহ কুরআন শেখা যায় |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শিক্ষক আবু সুফিয়ান সাহেব ক্লাসে সূরা আন নাস-এর শানে নুযূল ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার্থী উম্মে মারিয়া প্রশ্ন করে, “রাতের অন্ধকারে আমার খুবই ভয় হয়। এতে কী করা উচিত?” আরিফা বলে, “শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আমাদের মুসলিম সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বিপদে-আপদে সাহায্যের জন্য মানুষের কাছে দৌড়ায়, তা কি ঠিক?” জবাবে শিক্ষক সূরা আন নাস-এর শিক্ষা তুলে ধরেন এবং বলেন, “আমাদের সবকিছুতেই আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। মনে রেখো শয়তান মানুষের চরম শত্রু”।

- ক. কুরআন মাজীদেবের সর্বশেষ সূরা কোনটি ?
- খ. জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান বলতে কী বুঝ ?
- গ. বিপদ-আপদ এবং ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা পেতে উম্মে মারিয়া এ সূরা থেকে কী শিক্ষা নিতে পারে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শয়তান মানুষের চরম শত্রু—কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২। আবদুস সালাম ও আবদুর রহিম দুই বন্ধু। তারা একই সন্তোষ প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য ওয়াদা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু একদিন আবদুস সালাম তার খালাত ভাই এর-সাথে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তার বন্ধুকে না-জানিয়ে স্কুলে চলে যায়। স্কুলে আবদুস সালামের সাথে আবদুর রহিমের দেখা হলে আবদুর রহিম অভিযোগ করে বলে তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। অথচ হাদীসে আছে—যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, সে পরিপূর্ণ দীনদার নয়।

- ক. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কী ?
- খ. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বলতে কী বুঝ ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. আবদুস সালাম প্রতিশ্রুতি রক্ষা না-করার বিষয়টি হাদীসের আলোকে কিরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, সে পরিপূর্ণ দীনদার নয়। হাদীসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩। সূরা আল-আসর-এর অনুবাদ হল—সময়ের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। পরস্পরকে সৎ কাজের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। কিন্তু দেখা যায়, আবুল হাসনাত কখনও কারও ক্ষতি করে না। এমনকি অন্যায়ের প্রতিবাদও করে না। কাউকে কোনো সৎপারামর্শ পর্যন্ত দেয় না।

- ক. ‘আসর’ অর্থ কী ?
- খ. মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?
- গ. সূরা আসরের আলোকে হাসনাতের সামাজিক দায়িত্ব পালন হয়েছে কি না ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সৎ কর্ম ও ধৈর্য ধারণ সমাজে কীভাবে শান্তি আনতে পারে আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায় আখলাক (أَخْلَاقُ)

পরিচয়

আখলাক হচ্ছে খলুকুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহার। স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাক বলে। মানুষ সামাজিক জীব, তাই একজনকে অন্যজনের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়। মাতা-পিতা, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে লেনদেন, আচার-ব্যবহার করতে হয়। আর এ আচার আচরণ কখনও হয় প্রশংসনীয়, আবার কখনও নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় আচরণকে সচ্চরিত্র বা আখলাকে হামীদাহ্ আর নিন্দনীয় আচরণকে আখলাকে যামীমা বলে।

আখলাকে হামীদাহ্ হল তাকওয়া অর্জন করা, সত্যকথা বলা, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি। আর আখলাকে যামীমা হল মিথ্যাকথা বলা, আমানতের খিয়ানত করা, পরনিন্দা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, গালি দেওয়া ইত্যাদি। আখলাকে হামীদাহ্ অর্জন করা এবং আখলাকে যামীমা বর্জন করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্যকর্তব্য।

এ অধ্যায় পড়ে আমরা আখলাকের তাৎপর্য বলতে পারব। আখলাকে হামীদাহ্ ও যামীমার পাঁথক্য বলতে পারব।
আখলাকে যামীমা বর্জন করব। আখলাকে হামীদাহ্ অর্জন করব।

আখলাকে হামীদাহ্ (أَخْلَاقٌ حَمِيدَةٌ)

আখলাকে হামীদার তাৎপর্য

মানুষের জীবনে আখলাকে হামীদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণের তাৎপর্য অনেক। প্রশংসনীয় আচরণ মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে ও সৌহার্দ্য বজায় রাখে। এটা আমাদের জীবনকে মধুময় করে তোলে। এতে আমাদের পারস্পরিক লেনদেনও সহজতর হয়। মহানবী (স) সচ্চরিত্রের গুণত্ব সম্পর্কে বলেন, “কিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র” (তিরমিযী)। “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় যার চরিত্র উত্তম।” (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসংখ্য নিআমত দান করেছেন। এসবের মধ্যে সচ্চরিত্র একটি উত্তম নিআমত। উত্তম চরিত্র শিক্ষার জন্য আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে সর্বপ্রকার সংগুণাবলির প্রতীক।

আল্লাহ তাআলা বলেন— لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ

অর্থ : “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” (সূরা আহযাব : ২১)

এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) নিজেও বলেন—

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ —

অর্থ : “উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি”।

মহানবী (স)-এর সমগ্র জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

(التَّقْوَى) তাকওয়া

তাকওয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ হল: ভয় করা, বিরত থাকা, পরহেযগারী, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহ ভীতি। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে ইসলামের নির্দেশমতো জীবনযাপন করাকে তাকওয়া বলে। তাকওয়া অর্জনকারীকে মুত্তাকী বলে।

তাৎপর্য

তাকওয়ার তাৎপর্য অপরিমিত। তাকওয়া-বিহীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কোনো মূল্য নেই। যেমন কুরবানী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, “এগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া।” (সূরা হাজ্জ : ৩৭)

তাকওয়া মানবচরিত্রের একটি মহৎ গুণ। এর কারণে একজন মুসলমান যাবতীয় লোভ-লালসা, উদ্বেজনা পরিহার করে চলে। আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে। কথায় ও কাজে কাউকে কষ্ট দেয় না। অন্যায়ভাবে কারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করে না। মালে ভেজাল ও মাপে কম দেয় না, প্রতারণা করে না, মিথ্যাকথা বলে না, পরনিন্দা করে না। মুত্তাকী ব্যক্তিকে সকলে ভালো জানে, শ্রদ্ধা করে। বিপদে-আপদে তাকে সহায়্য করে।

মানুষের ইহকাল ও পরকালের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ। তাকওয়ার দ্বারা এ নিআমত লাভ করা যায়। আল্লাহ পাক বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

অর্থ : “আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।” (সূরা তাওবা : ৪)

যাবতীয় কাজকর্মে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।” (সূরা বাকারা : ১৯৪)

আল্লাহর নিকট মান-সম্মানের মাপকাঠি তাকওয়া। ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۝

অর্থ : “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।” (সূরা হুজুরাত : ১৩)

আমরা তাকওয়ার তাৎপর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব। আমরা আল্লাহকে ভয় করব। নিজেদের সবরকম পাপকাজ থেকে বিরত রাখব। খাঁটি মুমিন হিসেবে জীবনযাপন করব।

(التَّوَكُّلُ) তাওয়াক্কুল

পরিচয়

আল্লাহর ওপর ভরসা করা, নির্ভর করার নামই তাওয়াক্কুল। আল্লাহর ওপর যে নির্ভর করে ও ভরসা করে তাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুলকারী।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদানকারী। আল্লাহর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। কাজেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

অর্থ : “তোমরা একমাত্র আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল কর। যদি তোমরা মু’মিন হয়ে থাকো।” (সূরা মায়িদা : ২৩)

তাওয়াক্কুল একটি মহৎ গুণ। এতে মনে সাহস ও শক্তি বাড়ে এবং হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূর হয়। নিজকর্মে আগ্রহ বাড়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার সার্বিক কার্যাবলির জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন— “যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।” (সূরা ত্বালাক : ৩)

মহানবী (স) বলেছেন, “যদি তোমরা চেষ্টা করতে ও আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা রাখতে তবে আল্লাহ তোমাদের পশুপাখির ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশুপাখি সকালবেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সম্প্রদায় ভরাপেটে ফিরে আসে।” (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

আমরা কাজকর্ম করব। চেষ্টা সাধনা করব। প্রয়োজনীয় উপায়, উপকরণ ও কৌশল অবলম্বন করব। আর সফলতার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করব।

সত্যবাদিতা (الصِّدْقُ)

মানুষের সবচেয়ে ভালো গুণ হল সত্যবাদিতা বা সত্যকথা বলা। যে সত্যকথা বলে তাকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালোবাসে ও সম্মান করে। সত্যবাদী ব্যক্তি দুনিয়াতে যেমন মান-সম্মানের অধিকারী হন তেমনি আখিরাতেও তাঁর জন্য রয়েছে অনন্ত সুখশান্তি। সত্যবাদী ব্যক্তির মনোবল থাকে। তিনি সত্যকথা বলতে কাউকে ভয় করেন না। যে সত্য বলে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, ভালোবাসে না, সম্মান করে না। তার মনোবল থাকে না।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছোটকাল থেকেই সত্যবাদী ছিলেন। তিনি জীবনে মিথ্যাকথা বলেননি। জাহিলী যুগের আরবরা তাঁর এ সত্যবাদিতার কারণে তাঁকে খুব ভালোবাসত। তিনি সবার কাছে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে সুপরিচিত ছিলেন। সত্যবাদিতার উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

الصِّدْقُ يُنْجِيْ —

অর্থাৎ সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয়। মহানবী (স) বলেন, “তোমাদের উচিত সত্যবাদী হওয়া। কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পুণ্য বেহেশতের পথে পরিচালিত করে।” (বুখারী ও মুসলিম)

সত্যবাদিতা সম্পর্কে বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। তিনি তখন অল্পবয়স্ক বালক। শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি বাগদাদ গমনের সময় তাঁর মা তাঁকে সর্বদা সত্যকথা বলার উপদেশ দেন। যাত্রাপথে এক জায়গায় কাফেলা রাত্রিযাপনের জন্য তাঁবু খাটালে তাতে ডাকাত ঢুকে পড়ল। ডাকাতরা মালামাল লুটপাট করার জন্য প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করল, কার কাছে কী আছে। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-কে ডাকাতরা যখন জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে বলে জানানেন।

ডাকাতদের বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে তাঁকে ধমক দিয়ে বলল, ‘স্বর্ণমুদ্রা কোথায়? আমাদের তা দেখাও।’ তিনি জামার মধ্যে সেলাই-করা অবস্থায় ডাকাতদের তা বের করে দেখালেন। ডাকাতরা অবাক হয়ে বলল, ‘এরূপ লুকানো মুদ্রা আমরা খুঁজে পেতাম না, তুমি বললে কেন?’ তিনি বললেন, ‘আপনারা জিজ্ঞেস করায় আমি সত্যকথা বলে দিয়েছি। কারণ আমার মা সর্বদা আমাকে সত্যকথা বলতে উপদেশ দিয়েছেন।’ ডাকাতরা এতে নিজেদের পাপকর্ম সম্পর্কে অনুশোচনা করল এবং সৎপথে চলার প্রতিজ্ঞা করল। তারা ডাকাতি ছেড়ে দিল। এভাবেই সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়।

আমরা সত্যবাদিতার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সবসময় সচেতন থাকব, সদাসর্বদা সত্যকথা বলব এবং সত্যবাদী হব।

ওয়াদা পালন

ওয়াদা পালন করা মানে কথা দিয়ে কথা রাখা। কথামতো কাজ করা, চুক্তি রক্ষা করা।

গুরুত্ব

ওয়াদা পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** ○

অর্থ : “হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা পূরণ কর।” (সূরা মায়িদা : ১)

কিয়ামতের দিন ওয়াদা ও চুক্তি পালন করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আল্লাহ মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ বলেন, “তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৫)

মহানবী (স) বলেছেন, “ওয়াদা একধরনের ঋণ।” অর্থাৎ কারও নিকট থেকে ঋণ নিলে যেমন পরিশোধ করতে হয় তেমনি কারও সাথে ওয়াদা করলে তা পূরণ করতে হয়।

উপকারিতা

ওয়াদা পালনকারী সমাজে সম্মানের পাত্র। সকলে তাকে বিশ্বাস করে ও ভালো জানে। তার সাথে লেনদেন করতে আগ্রহী হয়। অভাব-অনটনে পড়লে তাকে সাহায্য করে। ফলে তার জীবন হয় সুনামের ও সুখময়, দুশ্চিন্তামুক্ত।

ওয়াদা ভঙ্গের কুফল

ওয়াদা ভঙ্গ করা একটি মারাত্মক অপরাধ। ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য এ দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান। আর পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি। যে ওয়াদা পালন করে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তার সাথে কেউ লেনদেন করতে চায় না। দুর্দিনে কেউ তার সাহায্য এগিয়ে আসে না। ফলে তার জীবন একেবারে দুঃখময় হয়ে পড়ে।

আমরা সতর্কতার সাথে ওয়াদা পালন করব। কথা দিয়ে কথা রাখব। সকলেই আমাদের ভালো জানবে। আমরা সুখী হব।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

আমাদের জীবনে পিতামাতার অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁরা আমাদের জন্য সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করেন। শিশুবয়স থেকেই তাঁরা কতই না আদর-স্নেহে আমাদের লালনপালন করে আসছেন, আমাদের সুখশান্তির জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আমাদের অসুখ-বিসুখে তাঁদের দুশ্চিন্তার কোনো সীমা থাকে না। গভীর মায়া-মমতায় তাঁরা আমাদের সকল কিছুর ব্যবস্থা করে থাকেন। পৃথিবীতে পিতামাতার চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই।

কর্তব্য

পিতামাতার প্রতি অনুগত থাকা, তাঁদের সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। সেই সাথে তাঁদের সেবা-যত্ন করাও আমাদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন-

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ○

অর্থ : “পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

পিতামাতা বৃন্দ হয়ে পড়লে তাঁদের সেবা-যত্ন করতে হবে। এমনকি তাঁরা মনে কষ্ট পান এমন কোনো কথাই তাঁদের সামনে বলা যাবে না। অত্যন্ত নম্রতার সাথে মার্জিত ভাষায় তাঁদের সাথে কথা বলতে হবে। তাঁদের সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর পিতামাতা ইন্তিকাল করলে তাঁদের জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট দুআ করতে হবে এই বলে-

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ○

অর্থ : “হে প্রতিপালক! তুমি তাঁদের প্রতি তেমনি সদয় হও, যেমনিভাবে তাঁরা (আদর-যত্নে) শৈশবে আমাকে লালনপালন করেছেন।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

খিদমতের সুফল

মহানবী (স) বলেছেন: **الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ** অর্থ: “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।”

মহানবী (স) আরও বলেন, “পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি; পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।”

পিতামাতার কথা মেনে চললে যেমন দুনিয়ায় সফলতা লাভ করা যায় তেমনি পরকালেও বেহেশত লাভ করা যায়।

আমরা পিতামাতার সকল আদেশ মেনে চলব, তাঁদের সেবা-যত্ন করতে ত্রুটি করব না, কোনো কথা বা কাজ দ্বারা কষ্ট দিব না। তাঁদের সুখশান্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্য

পরিচয়

আত্মীয়রা আপনজন। আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক যার সেই আত্মীয়। আত্মীয়স্বজন বলতে ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা-মামী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ফুফা-ফুফী, খালা-খালু, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং অন্যান্য নিকটস্থ বন্ধু-বান্ধবকে বুঝায়।

কর্তব্য

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনের পর আত্মীয়স্বজনের প্রতিও আমাদের অনেক কর্তব্য রয়েছে। এদের মধ্যে যারা ছোট তাদের আদর-স্নেহ করতে হবে এবং যারা বড় তাদের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে হবে। আবার এদের মধ্যে যারা সম্বল তাঁদের সাথে যেমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে হবে, তেমনিভাবে যারা দরিদ্র ও অভাবী তাঁদের যথাসাধ্য ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে হবে। রোগাক্রান্ত হলে সেবা-যত্ন করতে হবে এবং বিপদাপদে তাঁদের খোঁজখবর নিতে হবে।

আত্মীয়স্বজনদের কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া বা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ভীষণ অন্যায় কাজ। তবে অন্যায়মূলক বা কোনোপ্রকার পাপকর্মে আত্মীয়স্বজনকে সহযোগিতা করা সমীচীন নয় বরং সেক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর সেটাই হবে তাঁদের প্রতি সত্যিকারের দায়িত্ব পালন।

আল্লাহ তাআলা পিতামাতার পর আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

অর্থ : “পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।” (সূরা নিসা : ৩৬)

আত্মীয়স্বজনের প্রাপ্য অংশ বা হক আদায় করে দিতে হয়। এতে কোনোরূপ কুটিলতার আশ্রয় নেওয়া মহা-অন্যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হল—

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

অর্থ : “তুমি আত্মীয়স্বজনের হক দিয়ে দাও।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)

মহানবী (স) বলেছেন, “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।”

আমরা সকলে আত্মীয়স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করব ও তাঁদের প্রাপ্য দিয়ে দেব। তাঁদের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য করব। প্রতিটি ভালো কাজে সহযোগিতা করব।

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

পরিচয়

আমরা সামাজিক জীব। পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন ছাড়াও আমাদের পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে অনেক লোক আছে যাদের সাথে আমরা মিলেমিশে বসবাস করি। এরা সকলেই আমাদের প্রতিবেশী। মহানবী (স) বলেছেন, “আশেপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে।”

কর্তব্য

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা, অসুখে-বিসুখে তাঁদের খোঁজ-খবর নেওয়া, তাঁদের মজল কামনা করা, দোষত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো একজন সৎ প্রতিবেশীর অবশ্য কর্তব্য। প্রতিবেশীর সাথে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার বা তাঁদের ওপর জুলুম অত্যাচার করা অন্যায় কাজ। মহান আল্লাহ এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানবী (স) বলেছেন— “যার প্রতিবেশী অনাহারে রাত্রি যাপন করে সে প্রকৃত মুমিন নয়”।

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্যবহার ও তাঁদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে মহানবী (স) সর্বদা তাঁর অনুসারীদের তাকিদ দিতেন।

মহানবী (স) বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقَةٍ —

অর্থ : “সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যার প্রতিবেশীরা তার অন্যায় অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয়।”

(মুসলিম)

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করা মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। তিনিই আদর্শ মানুষ, যে বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বয়সে বড়দের সম্মান করতেন আর যারা তাঁর ছোট ছিল তাদের আদর করতেন। ছোটদের নানারূপ আবদারে তিনি কখনোই বিরক্ত বোধ করতেন না।

বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার গুরুত্ব অনেক। এতে ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করতে শিখে এবং বড়রা ছোটদের প্রাণভরে স্নেহ করে, ভালোবাসে। ফলে সমাজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মহানবী (স) বলেছেন—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا ۝

অর্থ : “এ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না।” (তিরমিযী)

বড়দের সাথে সাক্ষাৎ হলে ছোটদের সালাম দিতে হয়, সৌজন্য বজায় রেখে কথাবার্তা বলতে হয়। প্রয়োজনে তাঁদের কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হয়। তাঁরা শিক্ষামূলক যে সকল কথা বলেন তা শুনে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তাঁরা যে কাজ করার আদেশ দেন তা খুশিমনে পালন করতে হয়।

অনুরূপভাবে বড়দের কর্তব্য হচ্ছে, ছোটদের আদর-সোহাগ করা, তাদের সুন্দর আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া। আদর করলে শিশুরা আনন্দমনে আগ্রহের সঙ্গে উপদেশ গ্রহণ করে। এতে তাদের মনের প্রসারতা বাড়ে।

মহানবী (স) বলেছেন, “বার্ধক্যের কারণে যদি কোনো বৃদ্ধকে কোনো যুবক শ্রদ্ধা করে তাহলে আল্লাহ তাআলাও ঐ যুবকের জন্য বৃদ্ধ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে।” (তিরমিযী)

অতএব, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো এবং তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। অন্যদিকে ছোটদের স্নেহ করা ও তাদের আদর-সোহাগ করাও বড়দের একান্ত উচিত।

আমরা বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করব।

সহপাঠীদের সাথে সদ্যবহার

আমাদেরকে সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে মিশতে হয়। স্কুলে যাদের সাথে আমরা একই শ্রেণীতে লেখাপড়া করি তারা আমাদের সহপাঠী। সহপাঠীরা আমাদের প্রিয়জন। তাদের সাথে আমাদের এক আন্তরিক ও মধুর সম্পর্ক রয়েছে। স্কুলে থাকাকালীন আমরা একে অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি। কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করি, প্রয়োজনে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। কারও কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি না থাকলে তাকে তা দিয়ে সাহায্য করি। কেউ কোনো কারণে বিষণ্ণ বা চিন্তিত হলে তার বিষণ্ণতাব দূর করতে চেষ্টা করি। কারও কোনো দুঃসংবাদ আসলে তাকে আমরা সান্ত্বনা দিই, ধৈর্যধারণ করতে বলি। কারও কোনো সুখবর পেলে আমরা তার আনন্দে শরীক হই।

সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে স্কুলে এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের প্রতি খুশি হন। সহপাঠীদের সাথে আমরা সবসময় ভালো ব্যবহার করব, সকলে মিলেমিশে থাকব। কারও সাথে ঝগড়া করব না। কাউকে হিংসা করব না। এতে আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হবেন।

আখলাকে যামীমা (أَخْلَاقُ ذَمِيمَةٌ)

পরিচয়

আমরা আগেই জেনেছি নিন্দনীয় আচরণই হল আখলাকে যামীমা। মিথ্যাচার, মানুষের ওপর অত্যাচার, আত্মীয়স্বজনের অধিকার নষ্ট করা, গালি দেওয়া, ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ইত্যাদি কাজ আখলাকে যামীমা বা নিন্দনীয় আচরণ। নিন্দনীয় আচরণ মানুষকে অপমান ও নিন্দার পাত্রে পরিণত করে। কাউকে উপহাস-বিদূষ করা, কারও দোষারোপ করা, মন্দ নামে ডাকা, অমূলক ধারণা করা, নিন্দা করা ইত্যাদি নিন্দনীয় আচরণ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এ আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নবী কারীম (স) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তির স্থান সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।” (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী (স) যাবতীয় নিন্দনীয় আচরণ থেকে পূত-পবিত্র ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যাকথা বলেননি, কাউকে গালি দেননি, কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননি, কারও সঙ্গে প্রতারণা করেননি। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব। কখনও মিথ্যাকথা বলব না, ওয়াদা ভঙ্গ করব না, কারও সাথে প্রতারণা করব না এবং কারও গীবত করব না।

মিথ্যাচার (الْكَذِبُ)

প্রকৃত ঘটনা বা অবস্থাকে বিকৃত করে পরিবেশন করাকে মিথ্যাচার বলে। যে মিথ্যা কথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়।

মিথ্যাচার একটি নিন্দনীয় আচরণ এবং অত্যন্ত খারাপ কাজ। মিথ্যাকথা বলা মুনাফিকের পরিচয়। মিথ্যাচার মানুষের মানসম্মান নষ্ট করে। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না এবং তার কথার কোনো গুরুত্বও দেয় না। মহানবী (স) বলেছেন, “তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো, কারণ মিথ্যাচার অন্যায়কর্মের দিকে ধাবিত করে, আর অন্যায় দোষখের পথে ধাবিত করে।” (বুখারী ও মুসলিম)

সকল পাপের মূল হল মিথ্যাচার। মিথ্যা পরিত্যাগ করতে পারলে সকলপ্রকার পাপ থেকেই বাঁচা যায়। মিথ্যাবাদীকে মানুষ পছন্দ তো করেই না, এমনকি ফেরেশতারাও মিথ্যাবাদী থেকে দূরে চলে যান। মহানবী (স) বলেছেন, “বান্দা যখন মিথ্যাকথা বলে, ফেরেশতারা তখন এর দুর্গন্ধের কারণে দূরে চলে যান।” (তিরমিযী)

মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে এবং এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

কথিত আছে—একটি রাখাল বালক মাঠে গিয়ে খেলার সময় চিৎকার করে বলত, “বাঘ, বাঘ, বাঁচাও, বাঁচাও!” লোকেরা তাকে বাঁচানোর জন্য নিকটে গেলে সে বলত বাঘ চলে গেছে। এভাবে কয়েকদিন খেলা করার পর একদিন

সত্যি সত্যিই বাঘ এল, কিন্তু সেদিন চিৎকার করার পরও কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এল না। কারণ এতদিন সে মিথ্যা বলে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। বাঘ ছেলেটিকে খেয়ে ফেলল। এভাবেই মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। আমরা কখনও মিথ্যা কথা বলব না।

গীবত বা পরনিন্দা (الْغَيْبَةُ)

গীবত বলতে বুঝায় কারও অগোচরে তার এমন দোষত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করা যা শুনতে পেলে সে মনে কষ্ট পায়। গীবত একটি অতি জঘন্য গুণাহের কাজ এবং তা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

একবার নবী কারীম (স) সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে?” তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, “যা তোমার ভাই অপছন্দ করে, তা তার অসাক্ষাতে আলোচনা করলে গীবত হয়।” (মুসলিম)

গীবত একটি নিন্দনীয় কাজ। এর দ্বারা মানুষের সম্মান ও মর্যাদা খাটো হয়। মানুষে মানুষে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর কারণে সমাজে ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও নানারকম অশান্তি সৃষ্টি হয়। গীবত করাকে আল্লাহ তাআলা মৃতভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা একে অপরের গীবত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয় তা তোমরা অপছন্দ করবে।” (সূরা হুজুরাত : ১২)

প্রত্যেক মুসলমানের ধন, প্রাণ ও সম্মান অন্য মুসলমানের কাছে পবিত্র। গীবত অন্য মুসলমানের সম্মান নষ্ট করে। এ কারণে ইসলামে গীবত হারাম। গীবত শ্রবণ করাও অনুচিত।

আমরা কারও গীবত করব না। কারও গীবত শুনবও না। গীবতকারীকে ঘৃণার চোখে দেখব। এতে সমাজে শান্তি আসবে।

গালি দেওয়া (السَّبِّ)

গালি অর্থ কাউকে মন্দ বলা ও তিরস্কার করা। গালি দেওয়া একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। মুসলমানরা কাউকে গালি দেয় না। সমাজে একত্রে বসবাস করতে গেলে পরস্পরে মতপার্থক্য, ভুল-বুঝাবুঝি হতে পারে। একজনের সাথে অন্যের কথা কাটাকাটিও হতে পারে। তাই বলে একে অন্যকে অশালীন ভাষায় গালাগালি করা নিতান্তই খারাপ কাজ। যে গালি দেয়, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, সে নীচ ও ঘৃণিত। তাকে কেউ পছন্দ করে না। তার সাথে কেউ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা করতে চায় না। সমাজে তার কোনো মূল্য থাকে না।

মহানবী (স) মুসলমানদের একে অপরকে গালাগালি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন—

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থ : “মুসলমানদের গালি দেওয়া পাপ এবং হত্যা করা কুফরী।” (বুখারী ও মুসলিম)

গালির জওয়াবে গালাগালি করে প্রতি-উত্তর দেওয়া অনুচিত। মহানবী (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্প্রদায়ের ভিতর আমাকে এক ব্যক্তি গালি দেয় অথচ সে আমার থেকে নীচ। এর প্রতিশোধ নিতে আমার কী কোনো বাধা আছে?” রাসূল (স) তখন বললেন, “পরস্পর গালমন্দকারী উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং একে অপরের দোষারোপ করে।” নবী কারীম (স) আরও বলেছেন, “পিতামাতাকে গালি দেওয়া মহাপাপ।” সাহাবীগণ বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল এমন কোনো নরাদম আছে যে আপন পিতামাতাকে গালি দেয়?” তিনি বললেন, “যে অপরের পিতামাতাকে গালি দেয় এবং এভাবে অপরও তার পিতামাতাকে গালি দেয়।”

(বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যের পিতামাতাকে গালি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া।

আমরা গালির উত্তরে গালি দিব না, এতে গালমন্দকারী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং গালাগালির মতো নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার করবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা অবশ্যকর্তব্য। অপরদিকে তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি জঘন্য কাজ। আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করা, সম্পর্ক ছিন্ন না করা আল্লাহরই নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন—

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ۝

অর্থ : “পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার কর।” (সূরা নিসা : ৩৬)

আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত। কেউ তাকে পছন্দ করে না এবং তার সাথে কেউ সম্পর্ক রাখে না। বিপদে আপদে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না। সে সমাজে নিষ্ঠুর ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়। মহানবী (স) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে বলেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَّحِمٍ ۝

অর্থ : “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না”। (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী (স) আরও বলেন, “যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি রয়েছে আল্লাহর রহমত সেখানে অবতীর্ণ হয় না।” আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে অশান্তি নেমে আসে। সম্পর্ক ছিন্নকারী সমাজে অপদস্ত ও লাঞ্চিত হয়। তার জন্য রয়েছে পরকালে কঠোর শাস্তি।

আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব, বিপদাপদে আত্মীয়দের খোঁজখবর নেব। এতে আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হবেন। মানুষ আমাদের ভালোবাসবে।

রাহুযানি

রাহুযানি মানে ছিনতাই করা, জনপদে অসন্ত্রস্ত সাহায্যে কিংবা কোনো হিংস্র উপায়ে কোনো ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করে তার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াকে রাহুযানি বলে। রাহুযানি একটি জঘন্য গুনাহের কাজ। এ গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি সমাজের শত্রু। এদের কারণে সাধারণ মানুষ রাস্তা-ঘাটে বা জনপদে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল নিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে যেতে ভয় করে। ফলে তারা বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, দেশবাসী কষ্ট পায়।

রাহুযানি একটি মারাত্মক অপরাধ। এটি আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো জঘন্য কাজ। তাই এর শাস্তিও কঠিন। মহানবী (স) বলেছেন, “যে ব্যক্তি রাহুযানিতে লিপ্ত হয়, সে আমার উম্মাত নয়”। (আবু দাউদ)

রাহুযানির কারণে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। মানুষের অশান্তি ও দুর্ভোগ বাড়ে। আমরা রাহুযানিকে ঘৃণার চোখে দেখব। রাহুযানিতে লিপ্ত ব্যক্তি পরিত্যাগ করব। সাধ্যমতো প্রতিরোধ করব।

ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল

মানুষ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য এ পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে যা মানুষের কল্যাণকর তা হালাল বা বৈধ করেছেন। আর যা কল্যাণকর নয় তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ও নবী কারীম (স)-এর সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ অসংস্জ ও কুপ্ররোচনার কারণে নানাপ্রকার ক্ষতিকর জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এতে তার নিজের, পরিবারের ও সমাজের অশেষ ক্ষতি হয়। ধূমপান ও মাদকাসক্তি মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর অন্যতম।

ধূমপান

ধূমপান একটি ক্ষতিকর বদঅভ্যাস। এতে অর্থের অপচয় ও শারীরিক ক্ষতি সাধিত হয়। অপব্যয় করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তাআলা অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলেছেন।

আল্লাহর বাণী—

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ

অর্থ : “নিচয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই”। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭)

আল্লাহ আরও বলেছেন, “অপব্যয়কারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।” ধূমপানে পেট ভরে না, তাতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটে না। এর দ্বারা কোনো উপকার হয় না। কিন্তু এর জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা ব্যয় হয়। অতএব এটা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অপব্যয় মেটাতে ধূমপায়ীরা সংসারে অসচ্ছলতা ও আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে। আত্মীয়স্বজনের সাথে অসহ্যবহার করে। এতে পরিবার ও সমাজে নানারকম অশান্তি দেখা দেয়। অন্যদিকে ধূমপানের ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। আর এ দুর্গন্ধ মানুষকে কষ্ট দেয়। মানুষকে কষ্ট দেওয়া পাপের কাজ।

মহানবী (স) বলেছেন, “মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে যেন কেউ মসজিদে না যায়।” মুখে দুর্গন্ধ থাকলে মসজিদে নামাযীরা কষ্ট পায়, সভা-সমিতিতে অধূমপায়ীদের খুব কষ্ট হয়।

ধূমপান বলতে সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুকা ইত্যাদির ধোঁয়া পান বুঝায়। ধূমপানে বিষপান হয়। কারণ এতে থাকে নিকোটিন জাতীয় বিষ, যা ধীরে ধীরে মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন— ধূমপানের কারণে মানব শরীরে শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ক্ষুধামান্দ্য, হৃদরোগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং এর ফলে মানুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। যে ধূমপান করে শুধু সে-ই যে কেবলমাত্র রোগে আক্রান্ত হয় তা নয়, বরং তার সংস্পর্শে নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক নির্বিশেষে যে-ই আসে সে-ই আক্রান্ত হয়। দুইটি সিগারেটে যে নিকোটিন থাকে তা যদি কোনো সুস্থ মানুষের শরীরে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে সে নির্ঘাত মারা যাবে। সুতরাং আমরা নিজেরা ধূমপান করব না, যারা করে তাদের বিরত রাখতে চেষ্টা করব।

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক বদঅভ্যাস। মাদক বলতে ঐ বস্তুকে বুঝায় যা মানুষের দেহ ও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

মহানবী (স) বলেছেন—

الْخَمْرُ مَا خَمَرَ الْعَقْلَ—

অর্থ : “যা জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয় তা মাদকদ্রব্য।” (বুখারী)

বর্তমানে পরিচিত মাদকদ্রব্য হল—মদ, তাড়ি, হিরোইন, গাঁজা জাতীয় যেমন মারিজুয়ানা, চরস, ভাং। আফিম জাতীয় যেমন মরফিন, পেথিডিন, কোডিন, ফেনসিডিল এবং বিভিন্ন প্রকার ঘুমের ওষুধ। এসব দ্রব্যের কিছু কিছু ওষুধ হিসেবে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে নেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, ভাগ্য নির্ণয়ক তীর অপবিত্র; শয়তানের কাজ। তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।” (সূরা আলমায়িদাহ : ৯০)

মাদকাসক্ত ব্যক্তির নামায, রোযা এবং যাবতীয় ইবাদাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। মাদকাসক্তি তাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে। এজন্য তাদের পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মহানবী (স) বলেছেন, “মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (দারিমী)

মাদকাসক্তিতে যেমন সম্পদের অপচয় হয় তেমনি মাদকাসক্ত ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, হত্যাসহ নানা প্রকার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তি রুচিহীনতা, অপুষ্টি, লিভার ও কিডনি নষ্ট, শারীরিক শীর্ণতা, ওজন কমে যাওয়া, শ্বাসনালির ক্ষতি, কফ, কাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার পারিবারিক বন্ধন কমে যায়। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা ও জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। কোনো কাজে তার মন বসে না।

আমরা মাদকাসক্তির মতো খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকব। ইসলামে মাদকাসক্তি সম্পর্কে যে বিধি-বিধান আছে তা আমরা মেনে চলব। অসৎ ও মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য থেকে দূরে থাকব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গীবত শব্দের অর্থ হল—

ক. শত্রুতা

খ. ছিনতাই

গ. মিথ্যাচার

ঘ. পরনিন্দা

২। আল্লাহর নিকট মান-সম্মানের মাপকাঠি—

ক. তাকওয়া

খ. তাওয়াক্কুল

গ. সত্যবাদিতা

ঘ. ওয়াদাপালন

৩। “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” অনুদিত আয়াতটিতে বুঝানো হয়েছে—

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ক. রাসূলের প্রতি ভালোবাসা | খ. রাসূলকে অনুসরণ |
| গ. রাসূলের জীবনী পাঠ | ঘ. রাসূলকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করা |

৪। সত্যবাদীর মনোবল অটুট থাকে, কারণ—

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ক. তিনি সত্য বলতে দ্বিধা করেন না | খ. তিনি জানেন, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী |
| গ. তাকে সকলে ভালোবাসে | ঘ. তার বন্ধুর অভাব হয় না |

৫। করিম ঢাকায় চাকরি করে। তার মা গ্রামে অসুস্থ। তার সেবা করার অন্য কেউ নেই। মায়ের জন্য করিম কী করবে ?

- | |
|--|
| ক. চাকরিস্থল থেকে ছুটি নিয়ে মায়ের সেবা করবে |
| খ. চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে মায়ের সেবা করবে |
| গ. ঢাকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেবে |
| ঘ. মা ও তাঁর ডাক্তারের পরামর্শ মতো কাজ করবে |

৬। গীবত একটি ঘৃণিত আচরণ, কারণ—

- | |
|--------------------------------------|
| i. গীবত দুর্নীতির জন্ম দেয় |
| ii. গীবত করা হারাম |
| iii. গীবত সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে |

নীচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|------------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii এবং iii |

নিচের তথ্যের আলোকে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাঈমদের গাছের কয়েকটি ডাল তাদের প্রতিবেশীর বাড়ির উপর গিয়ে পড়েছে। এতে প্রতিবেশীর বাড়িতে আলোর সমস্যা হচ্ছে। তাদের অসুবিধা দেখে নাঈম তার পিতাকে বিষয়টি বলল।

৭। নাঈমের কাজটিতে ফুটে উঠেছে—

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. দায়িত্ববোধ | খ. শৃঙ্খলাবোধ |
| গ. মানবতাবোধ | ঘ. সংযম |

৮। নাঈমের পিতা উক্ত অবস্থায় কী করবেন ?

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ক. গাছগুলো কেটে ফেলবেন | খ. বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন |
| গ. ডালগুলো ছেঁটে দিবেন | ঘ. প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলবেন |

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। আবদুল হক বাজার থেকে দুই কেজি মাছ ক্রয় করে বাড়ি এসে মেপে দেখার পর সে ২০০ গ্রাম মাছ কম পায়। বাজারে ফিরে গিয়ে সে মাছ-বিক্রেতাকে ২০০ গ্রাম মাছ কম দেওয়ার কথা জানালে বিক্রেতা অস্বীকার করে। আবদুল হক বলে, ‘এটা মিথ্যাচার ও প্রতারণা। আপনার মধ্যে তাকওয়া থাকলে এমনটা করতে পারতেন না। আখিরাতে কিন্তু এর হিসাব বুঝে দিতে হবে।’
 - ক. তাকওয়া অর্থ কী ?
 - খ. তাকওয়া বিষয়টি বুঝিয়ে লিখ।
 - গ. মাছ-বিক্রেতার কাজটি কীভাবে তাকওয়া পরিপন্থী হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে লিখ।
- ২। সাজিদ একদিন স্কুলে যাচ্ছিল। পথে সে শুনতে পেল, গাছ থেকে পড়ে গিয়ে একটি ছেলের হাত-পা ভেঙে গেছে। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে দেখতে পেল ছেলেটি তাদের প্রতিবেশী নাহিদ। সে তখন বাড়ি ফিরে গিয়ে নাহিদের মা-বাবাকে খবর দিল এবং নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে সাহায্য করল। সাজিদের সেদিন আর স্কুলে যাওয়া হল না। কারণ সাজিদ জানে, আমাদের রাসূল (স) প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন।
 - ক. হাদীস অনুযায়ী কত ঘর পর্যন্ত লোকদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে ?
 - খ. প্রতিবেশীর প্রতি একটি কর্তব্য ব্যাখ্যা কর।
 - গ. অসুস্থ প্রতিবেশী নাহিদের প্রতি সাজিদ যে দায়িত্ব পালন করেছে তা কিরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশ—হাদীসের উদাহরণসহ কথ্যটি বুঝিয়ে লিখ।
- ৩। শাহীন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সজ্ঞাদোষে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে নেশার অর্থ যোগাতে তার মা-বাবার নিকট এটা-ওটা কেনার কথা বলে টাকা-পয়সা নেয়। এছাড়া গাড়িতে বা জনসমাবেশে বাবা মারা গেছে, মা অসুস্থ ইত্যাদি বলে নেশার টাকা যোগাড় করে। এভাবে শাহীন ধীরে ধীরে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায় এবং বাবা-মায়ের অনেক অর্থসম্পদ নষ্ট করে।
 - ক. মাদক কী ?
 - খ. শাহীন কেন মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. মাদকাসক্তি কীভাবে শাহীনের জীবনে ধ্বংস ডেকে এনেছে তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. মাদকাসক্তি অনেক মানুষের জীবন ও অর্থ নষ্ট করে দিচ্ছে—কথ্যটি বুঝিয়ে লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

হযরত আদম (আ)

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা করেন। আর ফেরেশতাদের ডেকে বলেন- “আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।” তাঁরা বলল, “আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? অথচ আমরাই তো আপনার গুণগান করছি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করছি।” তিনি বলেন, “আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।” আল্লাহ তাআলা এক মহান উদ্দেশ্যে আদমকে সৃষ্টি করলেন। সে উদ্দেশ্য হল তাঁর ইবাদাত করা ও হুকুম মেনে চলা এবং পৃথিবীতে তাঁর বিধি-বিধান চালু করা। তিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

অর্থ : “আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানুষ ও সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আ)। মহান আল্লাহ মাটি দ্বারা আদম (আ)-এর দেহের একটা আকৃতি বানালেন। এরপর সেই দেহের মধ্যে প্রাণ দান করলেন।

আল্লাহ আদম (আ)-কে সবকিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিলেন এবং এ জ্ঞানের কারণেই সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করলেন। এবার আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, “তোমরা আদম (আ)-এর সম্মানে সিজদাহ কর।” সকলে সিজদাহ করল, কিন্তু ইবলীস করল না। সে বলল, “আদম মাটির তৈরি আর আমি আগুনের তৈরি। আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ।” সে অহঙ্কার করল, আল্লাহ অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তাই ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে শয়তানে পরিণত হল।

আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে বেহেশতে থাকতে দিলেন। সেখানে নানারকম খাবার, ফল-ফলাদি, আরাম-আনন্দের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আদম ছিলেন একা, তাঁর একাকী ভাল লাগল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গী সৃষ্টি করলেন, তাঁর নাম হাওয়া (আ)। এবার আল্লাহ বলেন, “তোমরা বেহেশতে থাকো, যা খুশি পানাহার কর।” আল্লাহ তাঁদের একটি গাছ দেখিয়ে বললেন, “ঐ গাছটির নিকটেও যেও না। এ হুকুম না মানলে তোমাদের ভীষণ ক্ষতি হবে।”

আদম (আ)-কে সিজদাহ না করার কারণে আল্লাহ ইবলীসকে বেহেশত থেকে বের করে দেন। ইবলীস আদমের এ সুখ শান্তি সহ্য করতে পারল না। তাই সে আদমের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। অনেক ছলচাতুরির দ্বারা আদমকে আল্লাহর নির্দেশ ভুলিয়ে দিল। আদম (আ) ও হাওয়া (আ) নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলেন ও ফল ভক্ষণ করলেন। এজন্য আল্লাহ আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন।

আদম (আ) ও হাওয়া (আ) নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনেক কান্নাকাটি করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন এবং পৃথিবীতে সুখশান্তিতে বসবাস করার আদেশ দিলেন। সাথে সাথে বলে দিলেন, পৃথিবীতে তাঁরা যদি আল্লাহর নির্দেশমতো জীবনযাপন করে, তবে মৃত্যুর পর পুনরায় তাঁদের বেহেশতে বসবাস করতে দেওয়া হবে। এরপর আদম (আ) ও হাওয়া (আ) পৃথিবীতে বসবাস শুরু করলে তাঁদের মাধ্যমে অনেক মানব জন্মলাভ করে। ক্রমে ক্রমে পৃথিবী ভরে ওঠে মানুষে মানুষে। আমরা সকলেই তাঁদের বংশধর। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ) এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ)।

আদম (আ) ভুল করার পর আল্লাহর কাছে তওবা করেছিলেন। আমরাও যদি কোনো অপরাধ করি তাহলে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব, তওবা করব। আমরা তাঁর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

ইবলীস অহঙ্কার করার কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং বেহেশত থেকে বিতারিত হয়েছে। আমরা কখনও অহঙ্কার করব না।

হযরত নূহ (আ)

হযরত নূহ (আ) ছিলেন আল্লাহর একজন নবী। তিনি মানুষকে একনাগাড়ে নয়শত পঞ্চাশ বছর আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন। ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। কিন্তু এ দীর্ঘসময়ে শুধুমাত্র চল্লিশজন পুরুষ ও সমসংখ্যক নারী তাঁর কথায় সায দিয়ে ঈমান গ্রহণ করলেন। বাকিরা কাফিরই থেকে গেল।

হযরত নূহ (আ) প্রতিদিন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন আর ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তারা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, নানারূপ নির্ধাতন করত। তবুও সব কষ্ট সহ্য করে তিনি দাওয়াত দিতে থাকেন। দীর্ঘদিন এরূপ চলার পর একসময় তিনি নিরাশ হয়ে আল্লাহর কাছে বললেন, “হে প্রভু! আমার জাতিকে আমি দিনরাত তোমার দিকে আহ্বান জানিয়েছি কিন্তু তারা সাড়া না দিয়ে শুধু দূরে পলায়ন করতেই থাকে।” এরপর হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নিকট কাফিরদের ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য দুআ করেন।

আল্লাহপাক হযরত নূহ (আ)-কে বলেন, “আমার গয়ব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি নৌকা তৈরি করে রাখো। তুমি আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। যালিমদের জন্য কোনো সুপারিশ করবে না। কারণ তারা ডুবেই মরবে।” হযরত নূহ (আ) একটি বিশাল নৌকা নির্মাণ করলেন। নৌকা দেখে কাফিররা হযরত নূহ (আ)-কে পূর্বের চেয়ে বেশি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। তারা বলল, “এ মরুভূমিতে কীভাবে নৌকা ভাসবে?” তারা নৌকাটিতে মলমূত্র ত্যাগ করে অপবিত্র করে দিল। কিন্তু তারা জানত না যে, এ নৌকাটি মরুভূমিতেই ভাসবে। মহাপ্রাবনে স্বচ্ছন্দে ভেসে চলবে।

যখন প্রাবন শুরু হওয়ার সময় এল, আল্লাহ হযরত নূহ (আ)-কে ডেকে বললেন, “মুমিনদের এবং প্রত্যেক প্রাণী জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় উঠিয়ে নাও।” হযরত নূহ (আ) অনুসারীদের বললেন, “নৌকায় আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই নৌকা চলবে ও থামবে। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” নৌকা সবকিছু নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যেও চলতে লাগল।

চল্লিশদিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হল এবং মাটি থেকেও প্রবল বেগে পানি উঠল। পৃথিবী বানের পানিতে ডুবে গেল। কাফিররা বাঁচার জন্য পর্বতচূড়ায় উঠল। কিন্তু তাও ডুবে গেল, সকল কাফির মারা গেল। শুধুমাত্র হযরত নূহ (আ) এবং নৌকায় যারা আরোহণ করেছিলেন তারাই বেঁচে থাকলেন। কাফির হওয়ার কারণে হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র কিনআনও এ প্রাবনে ডুবে মারা গেল। এরপর প্রাবন বন্ধ করার জন্য হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। আল্লাহর কুদরাতে প্রাবন থেমে গেল, পানিও নেমে গেল।

হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা জুদী নামক পাহাড়ের ওপর থামল। নৌকা থেকে সকলে নেমে এলেন পৃথিবীতে। পৃথিবী আগের মতো আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। হযরত নূহ (আ) এবার পূর্ণ উদ্যম নিয়ে আল্লাহর দীন প্রচার করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত আদম (আ) যেমন পৃথিবী আবাদ করেছিলেন, হযরত নূহ (আ)-ও তেমনি পৃথিবী আবাদ করেন। এ কারণেই হযরত নূহ (আ)-কে আদমে সানী বা দ্বিতীয় আদম নামে অবিহিত করা হয়। হযরত নূহ (আ) ছিলেন সত্য ও ন্যায় প্রচারে আপোষহীন। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সত্য প্রচার থেকে এতটুকু থেমে থাকেননি। দীনের স্বার্থে তিনি সবরকম লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করেছেন।

সত্য ও ন্যায় প্রচারে আমাদের জীবনেও দুর্ভোগ ও নির্ধাতন নেমে আসতে পারে। আমরা এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য-ধারণ করব এবং আল্লাহর দীনের ওপর অটল থাকব।

হযরত সালিহ (আ)

হাজার হাজার বছর পূর্বে এ পৃথিবীতে সামুদ নামক একটি জাতি বসবাস করত। আল্লাহ তাদের ন্যায়ের পথে ডাকার জন্য একজন নবী পাঠালেন। তাঁর নাম হযরত সালিহ (আ)। তিনি মানুষদেরকে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে আহ্বান জানালেন। আল্লাহ বলেন, “সামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠালাম।”

হযরত সালিহ (আ) তাদের বললেন, “তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।” হযরত সালিহ (আ)-এর আহ্বানে তারা কোনো সাড়াই দিল না বরং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করল। পরিশেষে তারা বলল, “হে সালিহ! তুমি যে নবী, তোমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ কী? পারলে তুমি আমাদের মু'জিয়া দেখাও।”

মু'জিয়া মানে অলৌকিক ঘটনা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কী ধরনের মু'জিয়া দেখতে চাও?” সকলে একটি পাহাড় দেখিয়ে বলল, “এ পাহাড় থেকে এমন একটি উটনীর বের কর যেটি বাচ্চা প্রসব করবে এবং দুধ দিবে।” হযরত সালিহ (আ) বললেন, “মু'জিয়া আমি দেখাব, তবে একটি শর্ত আছে, আর তা হল তোমরা উটনীকে কোনোপ্রকার কষ্ট দিতে পারবে না। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন।”

হযরত সালিহ (আ) আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। মুহূর্তেই একটি বিকট শব্দ হল। আর অমনি বিশাল পাথর ফেটে গিয়ে একটি বিরাট উটনীর বের হল এবং সাথে সাথে একটি বাচ্চাও প্রসব করল। প্রচুর পরিমাণে দুধও দেওয়া শুরু করল। সকলে চমকিত হল। সামুদ জাতির লোকেরা উটনীর দুধ পান করে সচ্ছলতার সাথে দিনযাপন করতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কতিপয় কাফির একত্রিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর নবী হযরত সালিহ (আ)-এর আদেশ অমান্য করে উটনীকে যবেহ করে।

হযরত সালিহ (আ) এ ঘটনায় ভীষণ মনঃক্ষুব্ধ হলেন। তিনি কাফিরদের বললেন, “এ পাপের ফলে তিন দিনের মধ্যে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসবে।” ঠিকই তিন দিন পর হযরত জিবরাঈল (আ) ঐ এলাকায় আসলেন এবং এমন জোরে চিৎকার দিলেন যে, কাফিররা সকলে নিজ নিজ স্থানে মরে পড়ে থাকল।

হযরত সালিহ (আ) এ ঘটনার পর সিরিয়ায় চলে যান এবং আল্লাহর দীন প্রচার করতে থাকেন। এরপর সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত সালিহ (আ)-এর জাতি আল্লাহর ও তাঁর নবীর নির্দেশের বিরোধিতার কারণে সমূলে ধ্বংস হয়েছিল।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)

জন্ম

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

আরবের অবস্থা

তাঁর জন্মের সময় আরবের লোকেরা ছিল নানা পাপে লিপ্ত। মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি করেই তৎকালের লোকদের জীবন চলত। এক আল্লাহ-কে ভুলে তারা নানা দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করত। পবিত্র কা'বা শরীফ তারা মূর্তিতে ভরে রেখেছিল। বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচাকেনা হত। মনিবরা দাস-দাসীদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করত। নারীদের কোনো মানসম্মান বা অধিকার ছিল না। এমনকি সেসময় মেয়েশিশুদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হত।

এরূপ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে পাঠান। তাঁর আগেও অনেক নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন। আমাদের নবীই হলেন সর্বশেষ নবী। সকল নবীর সেরা নবী বিশ্বনবী।

বংশ-পরিচয়

তিনি মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মায়ের নাম আমিনা। জন্মের ছয় মাস পূর্বেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ এবং আহমাদ।

লালনপালন

আরবের উচ্চবংশীয়দের তৎকালের প্রথা অনুযায়ী তাঁর লালনপালনের ভার পড়ে ধাত্রী হালিমার ওপর। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি নিজের সন্তানের মতো আদর-যত্নে শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে লালনপালন করেন। এরপর মুহাম্মাদ (স) ফিরে আসেন মা আমিনার কোলে। মা আমিনা সীমাহীন আদর-সোহাগে পুত্রকে কোলে তুলে নেন।

কিন্তু তাঁর কপালে এ আদর বেশিদিন রইল না। তাঁর মাও ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। এবার তিনি পিতামাতা দুইজনকেই হারিয়ে ইয়াতীমে পরিণত হন। উম্মে আয়মন নামক একজন পরিচারিকা ইয়াতীম মুহাম্মাদ (স)-কে দাদা আব্দুল মুতালিবের হাতে তুলে দেন। দাদার আশ্রয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স) পালিত হতে থাকেন। কিছুদিন পর দাদাও তাঁকে ছেড়ে চলে যান পরপারে। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আট বছর। এবার তিনি চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন। চাচার সংসারে ছিল অভাব-অনটন। তিনি এসময় মেষ চরান, চাচার ব্যবসাকার্যে সহযোগিতাও করেন। এ সময় একবার চাচার সাথে ব্যবসা করতে তিনি সিরিয়াও গিয়েছিলেন। সিরিয়া ভ্রমণে তাঁর সাথে বহীরা নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রীর দেখা হয়।

বহীরা তাঁর চাচাকে ডেকে বলেন, বালকটিকে তিনি যেন সাবধানে রাখেন। শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে পারে। এ বালকটি হবে শেষ যমানার নবী; সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

হযরত মুহাম্মাদ (স) তখন যুবক। ওকায় মেলায় জুয়াখেলাকে কেন্দ্র করে ফিজার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। চলল একটানা পাঁচ বছর। অনেক মানুষ আহত নিহত হয়। মুহাম্মাদ (স) এ হিংসা হানাহানি, রক্তারক্তি দেখে ব্যথিত হলেন। কীভাবে শান্তি স্থাপন করা যায় তিনি ভাবতে লাগলেন।

অবশেষে শান্তিকামী কতিপয় যুবক নিয়ে তিনি ‘হিলফুল ফুযুল’ নামে একটি শান্তিসংঘ গঠন করলেন। এর দ্বারা তিনি গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি স্থাপন করলেন এবং মারামারি হানাহানি বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। ইতোমধ্যেই সত্যবাদী, পরোপকারী, শান্তিকামী যুবক হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আপন পর সকলে তাঁকে আল-আমীন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করল।

বহুদিন পূর্বের নির্মিত পুরাতন কা’বাগৃহ সঙ্কারণের কাজ হাতে নিল কুরাইশরা। যথারীতি কা’বাঘর পুনর্নির্মাণও করল তারা। কিন্তু পবিত্র ‘হাজরে আসওয়াদ’ বা কালো পাথর স্থাপন নিয়ে বিবাদ লেগে গেল। প্রত্যেক গোত্রই এ পাথর কা’বার দেয়ালে স্থাপন করার সম্মান অর্জন করতে চাইল। যুদ্ধের সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল আগামী দিন প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সবার আগে কা’বাগৃহে আগমন করবে তার ওপরই বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পিত হবে। সে যা সিদ্ধান্ত দিবে তা সকলে মেনে নিবে।

প্রত্যুষে দেখা গেল হযরত মুহাম্মাদ (স) কা’বায় প্রবেশ করছেন, অমনি সকলে চিৎকার দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে বলল: আল-আমীন আসছেন, সঠিক মীমাংসাই হবে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) একখানা চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর চাদরে নিজ হাতে পাথরখানি রাখলেন। সকল গোত্রের সরদারকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন। এরপর যথাস্থানে তা তারা বহন করে নিয়ে গেল। হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজের হাতে পাথরখানি কা'বার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। একটি অনিবার্য যুদ্ধ থেকে সকলে বেঁচে গেল। পাথর ওঠাবার সম্মান পেয়ে সকলে খুশিও হল।

খাদীজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ

তৎকালে আরবে একজন বিখ্যাত ধনী মহিলা ছিলেন, তাঁর নাম খাদীজা। তিনি তাঁর বিশাল বাণিজ্য দেখাশুনা করার জন্য একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্দর চরিত্রের সুনাম শুনে তিনি তাঁর ওপর ব্যবসায়ের ভার অর্পণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) খাদীজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান। ব্যবসায় প্রচুর লাভ করে তিনি মক্কা ফিরে আসেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সততা, কর্মদক্ষতা দেখে খাদীজা মুগ্ধ হন। এরপর তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অভিভাবক তখন তাঁর চাচা আবু তালিব। আবু তালিব মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গে হযরত খাদীজার বিবাহের সকল ব্যবস্থা করে দেন। শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হল। তখন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বয়স পঁচিশ বছর আর হযরত খাদীজা (রা)-এর চল্লিশ বছর।

নবুওয়্যাত লাভ

হযরত মুহাম্মাদ (স) শিশুবয়স থেকে মানুষের মুক্তি এবং শান্তির জন্য ভাবতেন। যুবকবয়সে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হয়। খাদীজার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তাঁর ধ্যান-সাধনা আরো বৃদ্ধি পায়। মূর্তি পূজায় লিপ্ত এবং নানা দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত মানুষের মুক্তির জন্যই তাঁর সব ভাবনা। মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে থাকবে, এটা হয় না। কী করা যায়, কীভাবে মানুষের হৃদয়ে এক আল্লাহর ভাবনা জাগানো যায়, শিরক ও কুফর থেকে তাদের মুক্ত করা যায় এ সকল বিষয়ের চিন্তা-ভাবনায় তিনি মগ্ন। বাড়ি থেকে বেশ দূরে হেরা গুহায় গিয়ে নির্জনে এ বিষয়ে ধ্যান করতেন। কখনো কখনো একাধারে দুই-তিন দিনও সেখানে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধ্যান করার পর অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়্যাতপ্রাপ্ত হন।

আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম থেকে নবুওয়্যাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবন আলোচনা থেকে জানতে পারি যে, তিনি ছিলেন সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যাকথা বলেননি, কাউকে গালি দেননি, কারো সাথে প্রতারণা করেননি, ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। তিনি ছিলেন মানুষের কল্যাণকামী, শত্রুও তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে পৃথিবীতে শান্তি আসবে। আমরা তাঁর জীবন-আদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত আবু বকর (রা)

পরিচয়

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)। মক্কার কুরাইশ বংশের তায়ম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু কুহাফা উসমান আর মাতার নাম উম্মুল খায়র সালমা। তাঁর পিতামাতা উভয়ই মহানবী (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শিশুবয়স হতেই তিনি কোমল ও সুন্দর স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত। শিক্ষা শেষ করে তিনি গোত্রীয় পেশা ব্যবসা শুরু করেন। মহানবী (স)-এর প্রায় সমবয়সী হওয়ায় তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা)-এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। মহানবী (সা) তখনও নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হননি, তবুও তিনি যা বলতেন হযরত আবু বকর (রা) সবই বিশ্বাস করতেন।

হযরত আবু বকর (রা) একবার ইয়ামানে বাণিজ্যে গেলেন। মক্কা ফিরে শুনলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) নবুওয়্যাত লাভ করেছেন, তিনি একত্ববাদের ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেছেন। সব শুনে আবু বকর (রা) সোজা নবী কারীম (স)-এর কাছে হাজির হলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। ইসলাম প্রচার করার কারণে মক্কার লোকেরা নবী কারীম (স)-এর সঙ্গে শত্রুতা শুরু করল। হযরত আবু বকর (রা) এ অবস্থায় সবসময় মহানবী (স)-এর সঙ্গে থাকতেন। নবী কারীম (স) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন নবী কারীম (স)-এর পাশে থেকে হযরত আবু বকর (রা) কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। নবী কারীম (স)-কে মক্কায় কাফিররা হত্যা করতে চাইলে তিনি হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা হিজরত করেছিলেন।

ইসলামের সেবা

হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় হযরত উসমান, হযরত তালহা, হযরত যুযায়র, হযরত আব্দুর রহমান, হযরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ বড় বড় সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম দাসদাসীদেরকে তাদের কাফির মনিবরা কঠিন শাস্তি দিত, নির্যাতন করত। হযরত আবু বকর (রা) এসব দেখে মনে কষ্ট পেতেন। তাই নিজের অর্থে এদের কিনে মুক্ত করে দিতেন। এভাবে হযরত বিলাল (রা)-সহ অনেককে তিনি কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

তাবুক যুদ্ধের সময়ে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সকল ধনসম্পদ নিয়ে নবী কারীম (স)-এর সামনে হাজির হলেন। নবী কারীম (স) জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি ঘরে কী রেখে আসলে?” তিনি বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।”

খলীফা নির্বাচন

মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম-সাম্রাজ্যের খলীফা নির্বাচিত হন হযরত আবু বকর (রা)। এ সময় মুসলিম সাম্রাজ্যে কতগুলো সমস্যা দেখা দেয়। কিছুলোক নবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করে, আবার কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা) কঠোরভাবে সব বিশৃঙ্খলা দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। নবী কারীম (স)-এর আদর্শমতো দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনকালে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে অনেক হাফিজ সাহাবী শহীদ হন। এরপর কুরআন বিপন্ন হওয়ার ভয়ে হযরত আবু বকর (রা) কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। সে সময় আমাদের যুগের মতো কাগজ ছিল না। ছাপাখানা ছিল না। তাই সাহাবীগণ গাছের বাকলে, হাড়ে, চামড়ায় লিখে রেখেছিলেন কুরআনের আয়াত। হযরত আবু বকর (রা) সব একত্র করে একটি কপি করলেন এবং মহানবী (স)-এর স্ত্রী বিবি হাফসা (রা)-এর নিকট তা গচ্ছিত রাখলেন। ইসলামের এসব মহৎ কর্মের জন্য তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

চরিত্র

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন সাদাসিধে মানুষ। জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। তিনি জ্ঞানী ও গুণী দানশীল ছিলেন। মানুষের সেবা করতে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। ইসলামের সেবায় হযরত আবু বকর (রা)-এর দান ছিল অতুলনীয়। তিনি ইসলামের জন্য তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্যই মহানবী (স) বলেছেন, “সামর্থ্য ও ধনসম্পদ দিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি উপকার করেছে আবু বকর।” তিনি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের সেবায়, দান-দাক্ষিণ্যে, চারিত্রিক দৃঢ়তায় সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে বর্তমান বিশ্ব নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

হযরত উমার ফারুক (রা)

পরিচয়

মহাবীর হযরত উমার ফারুক (রা) ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা। তিনি ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। সকলে তাঁকে আবু হাফস নামে ডাকত। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতাম। উমার বাল্যকালে শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। বড় হয়ে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তিনি ছিলেন চরিত্রবান, নামকরা কুস্তিগীর, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা।

ইসলাম গ্রহণ

মহানবী (স) যখন মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বললেন তখন স্বার্থবাদী কুরাইশরা মহানবী (স)-এর ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। সে ঘোষণা শুনে উমার কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে নবী কারীম (স)-কে হত্যা করতে ছুটলেন। পথে ঘটল এক ঘটনা। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, উমার! তুমি কোথায় যাচ্ছ? রাগত স্বরে জবাব দিলেন, মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যা করতে। ঐ ব্যক্তি বললেন, তোমার বোন, ভগ্নীপতি যেখানে মুসলমান হয়ে গেছে সেখানে তাদের কিছু বলতে পারছ না, অথচ মুহাম্মাদকে হত্যা করবে? উমার (রা) অপমান বোধ করে আরও রেগে গেলেন। সোজা বোনের বাড়ি গেলেন। ঘরের বাইরে থেকে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনলেন। তিনি ঘরে ঢুকে বোন ও ভগ্নীপতিকে মারধোর শুরু করলেন।

তাঁর মারপিটে তাঁদের শরীর ফেটে রক্ত বের হতে দেখে উমারের হৃদয়ে মায়া জাগল। উমার (রা) বললেন, তোমরা কী পাঠ করতেন? উমারের বোন বললেন, আল-কুরআন। উমার বললেন, আমাকে তা দেখাও। বোন বললেন, অপবিত্র শরীরে তা স্পর্শ করা যায় না। উমার পবিত্র হয়ে এলে তিনি তা তাঁকে দিলেন। উমার মহান আল্লাহর বাণী পাঠ করে কেমন যেন হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, নবী মুহাম্মাদ (স) কোথায়? আমি মুসলমান হব। এরপর নবী কারীম (স)-এর কাছে গিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং কা'বার সামনে প্রকাশ্যে নামায আদায়ের সংকল্প ব্যক্ত করলেন। নবী খুশি হয়ে উমারকে উপাধি দিলেন 'ফারুক' বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী। মুসলমান হয়ে উমার (রা) ইসলামপ্রচার কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সর্বদা নবী কারীম (স)-এর সাথে থেকে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

খলীফা নির্বাচন

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ইন্তিকাল করলে হযরত উমার (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত হয়। রোম, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, ফিলিস্তিন জয়লাভ করে।

সুশাসন

আল্লাহর বাণী ও মহানবী (স)-এর আদর্শমতো হযরত উমার (রা) রাজ্যশাসন করতেন। আইনের চোখে সকলকে সমান দেখতেন। তিনি মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শামাকেও কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে রাজ্যে কোনো অভাব ছিল না। তিনি গভীর রাতে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। আইনের বেলায় তিনি যেমন ছিলেন কঠোর। আবার মানুষের দুঃখ-কষ্টে ছিলেন তেমনি কোমল।

এক রাতে তিনি ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না শুনে নিজের কাঁধে আটার বস্তা বহন করে তাদের ঘরে দিয়ে আসেন এবং শিশুদের তৃপ্ত করে আহার করান। তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। জেরুজালেমে যাওয়ার পথে তিনি পালান্ধ্রমে নিজের চাকরকে উঠের পিঠে চড়িয়ে নিজে পায়ে হেঁটে চলেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ ভীরু। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। তিনি হিজরি সন প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে কৃষিকাজে অনেক উন্নতি হয়েছিল।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত উমারের ভয়ে পৃথিবীর রাজা-বাদশাগণ সবসময় থাকতেন কম্পমান; অথচ তিনি নিজে গরিবের মতো সাদাসিধে চলাফিরা করতেন। কোনো দেহরক্ষীও তার ছিল না। সামান্য যা জুটত তাই আহার করে সারাদিন জনগণের খিদমত করতেন। জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি অসংখ্য মসজিদ, সেতু, হাসপাতাল, সড়ক, বিদ্যালয় নির্মাণ করেন এবং অনেক খাল খনন করেন। ইবাদাত বন্দেগি ও কুরআন তিলাওয়াতে তিনি অনেক সময় কাটাতেন।

শাহাদাত বরণ

একদিন ফজরের নামাযে ইমামতি করার সময় আবু লুলু নামক এক ইয়াহুদী চর তরবারি দ্বারা তাঁকে আঘাত করে এবং এতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ন্যায়বিচার, প্রজাবাৎসল্য, সুশাসন, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে হযরত উমার (রা) সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আদর্শ। আজকের দুনিয়া তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে অনেক সমস্যার সুন্দর সামাধান হতে পারে।

আমরা তাঁর আদর্শ মেনে চলব এবং তাঁর মহান আদর্শে উজ্জীবিত হব।

হযরত উসমান (রা)

পরিচয়

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা ছিলেন হযরত উসমান (রা)। ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল গনী এবং যুননুরাইন। গনী অর্থ ধনী। তিনি তৎকালের আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ছিলেন বলে তাঁকে গনী বলা হত। যুননুরাইন অর্থ দুইটি নুরের অধিকারী। তিনি মহানবী (স)-এর দুই কন্যা বুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে বিবাহ করেছিলেন বলে তাঁকে যুননুরাইন বলা হত। তাঁর পিতার নাম আফ্ফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ। শিশুকাল হতেই তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায়ও ছিলেন সুপরিচিত। যৌবনে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে অগাধ সম্পদের মালিক হন।

ইসলাম গ্রহণ

চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে অনেক নির্যাতন করে। সব নির্যাতন সহ্য করেও তিনি ইসলামে অটল-অবিচল থাকেন।

ইসলামের সেবা

মহানবী (স) মদীনায় হিজরত করার পর মুসলমানদের পানির কষ্ট দেখে উসমান (রা) অনেক অর্থ ব্যয়ে বুমা নামে একটি কূপ ক্রয় করে মুসলমানদের পানির কষ্ট দূর করেন। মসজিদে নববী সম্প্রসারণের সময় এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করে দেন। উসমান (রা) মহানবী (স)-এর খিদমতে সর্বদা লেগে থাকতেন। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি তাঁদের পরামর্শদাতা ছিলেন। হযরত উমার (রা) শাহাদাত বরণ করার পর হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হন।

কুরআন সংকলন

তিনি একবার লক্ষ্য করেন যে, আরবের বিভিন্ন গোত্রে পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করা হয়। এতে তিনি শঙ্কিত হন। এরপর হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট থেকে আনিয়ে এর অনেক কপি করান এবং মুসলিম-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। এভাবে তিনি মুসলিমজাতির সংহতি রক্ষা করেন। এজন্য তিনি জামিউল-কুরআন (কুরআন-সংকলনকারী) হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

শাহাদাত

তঁার খিলাফতের শেষদিকে ইসলামবিরোধীরা গভীর ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের মাঝে ঝগড়া-বিভেদ সৃষ্টি করে। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে অশান্তি দেখা দেয়। সরল প্রকৃতির মানুষ হযরত উসমান (রা) এসময় কতিপয় বিপথগামীর হাতে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন পাঠরত অবস্থায় নিজগৃহে শাহাদাত বরণ করেন।

আমরা হযরত উসমান (রা)-এর দানশীলতা, উদারতা ও আল্লাহ নির্ভরশীলতার আদর্শে উজ্জীবিত হব।

হযরত আলী (রা)

পরিচয়

হযরত আলী (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। আবু তালিব ছিলেন তাঁর পিতা। শিশু বয়স হতেই মহানবী (স)-এর সঙ্গে থাকতেন। হযরত আলী (রা) যখন দশ বছরের বালক তখন মহানবী (স) নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। হযরত আলী (রা) এ সময় ইসলাম গ্রহণ করে বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যখন মুসলমানগণ কাফিরদের নির্যাতনে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত আলী (রা) মহানবী (স)-এর সাথেই থেকে যান। কাফিররা মহানবী (স)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মহানবী (স) আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন এবং মক্কাবাসীর গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দেওয়ার জন্য নিজের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আলী (রা)-কে ঘরে রেখে যান। হযরত আলী (রা) নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহানবী (স)-এর ঘরে অবস্থান করেন।

বীরত্ব

হযরত আলী (রা) ছিলেন শক্তিশালী সাহসী যোদ্ধা। তিনি মহানবী (স)-এর সঙ্গে থেকে অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। খায়বার যুদ্ধের সময় ইয়াহুদীদের সুরক্ষিত কামুস দুর্গ কেউই যখন জয় করতে পারল না, তখন মহানবী (স) হযরত আলী (রা)-কে পাঠালেন। হযরত আলী (রা) দুর্গের বিশাল লোহার দরজাটিকে এক ধাক্কায়ে হাতে তুলে নিলেন এবং ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে থাকলেন। ইয়াহুদীরা এই অবস্থা দেখে ভয়ে সকলে আত্মসমর্পণ করল। যুদ্ধের পর ঐ কপাটটি অনেক শক্তিশালী যুবকও তুলতে পারেনি। এ ঘটনায় মহানবী (স) হযরত আলী (রা)-কে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দান করেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে মহাবীর হযরত আলী (রা)-এর হাতেই মুসলিম বাহিনীর পতাকা শোভা পাচ্ছিল।

খলীফা নির্বাচন

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করলে হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হন। নানা সমস্যার মধ্যেও তিনি জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করতেন।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

শিশুবয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আলী (রা) অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। কঠোর পরিশ্রম করে আহার জোটাতে। খেয়ে না-খেয়ে তিনি জীবন কাটাতেন। অহঙ্কার বলতে তাঁর মধ্যে কিছুই ছিল না। মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও তিনি সংসারের কাজ নিজ হাতেই করতেন। বসবাস করতেন জীর্ণশীর্ণ একটি কুটিরে। তিনি ধনী-দরিদ্র সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। হযরত আলী (রা) ছিলেন সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তিনি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে নামাযরত অবস্থায় এক ইয়াহুদী আততায়ীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

আমরা তাঁর জীবনচরিত থেকে বীরত্ব, নিরহঙ্কার ও সহজ সরল জীবনযাপনের আদর্শ গ্রহণ করব।

হযরত খাদীজা (রা)

পরিচয়

বিশ্বের ইতিহাসে যে কয়জন পুণ্যবতী নারী প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা) অন্যতম। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশেই তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন খুওয়াইলিদ ইব্ন আসাদ। হযরত খাদীজা (রা)-এর উপাধি ছিল তাহিরা বা পুণ্যবতী। তিনি ছিলেন শিক্ষিতা ও সম্পদশালিনী। সমগ্র আরব জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল।

মহানবী (স)-এর সুন্দর চরিত্র ও মানবসেবার সুনাম সম্পর্কে অবগত হয়ে হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে তার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। মহানবী (স) তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে সিরিয়া যান এবং সততা ও দক্ষতার সাথে ব্যবসা করে প্রচুর লাভ করে ফিরে আসেন।

বিবাহ

মহানবী (স)-এর সততা ও দক্ষতা দেখে হযরত খাদীজা (রা) তাঁর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহানবী (স)-এর বয়স তখন পঁচিশ বছর আর হযরত খাদীজা (রা)-এর বয়স চল্লিশ বছর। বিবাহের পর হযরত খাদীজা (রা) প্রিয় নবী (স)-কে তাঁর সকল সম্পদ দান করে দেন এবং মহানবী (স)-এর খিদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

ইসলাম গ্রহণ

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হয়ে নবীজী ভীত হয়ে পড়েন। হযরত খাদীজার কাছে বললেন, “আমাকে বস্ত্রে আবৃত কর। আমার ভয় হচ্ছে।” হযরত খাদীজা (রা) সব শুনে নবী কারীম (স)-কে সান্ত্বনা দিলেন। সেবা-শুশ্রূষা করলেন আর বললেন, “আল্লাহ আপনাকে অপদস্ত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, দুস্থ অভাবীদের সাহায্য করেন।” এরপর হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ ওয়ারাকার নিকট নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা সব শুনে বললেন, “এতে ভয়ের কিছু নেই। হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা তাঁর কাছে ওহী নিয়ে এসেছেন।” নবী কারীম (স) আল্লাহর নির্দেশে ইসলাম প্রচার শুরু করলে সর্বপ্রথম মুসলমান হন হযরত খাদীজা (রা)। তিনি ইসলাম প্রচারে নবীজীকে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা করতে থাকেন। মক্কার লোকেরা যখন নবীজীর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তখন হযরত খাদীজা সর্বদা নবী কারীম (স)-এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দিতেন। দীন প্রচারে উৎসাহ দিতেন। মহানবী (স)-এর মানমর্যাদা ও সম্মানের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর ছিল অগাধ স্বামীভক্তি।

শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (স) বলেছেন, বিশ্বের সকল নারীর উপর চারজনের সম্মান রয়েছে— হযরত মারইয়াম, হযরত খাদীজা, হযরত ফাতিমা, হযরত আসিয়া। হযরত খাদীজা (রা) নবুওয়্যাতের দশম বর্ষে রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালে মহানবী (স) মর্মাহত হন।

সুন্দর চরিত্র, স্বামীভক্তি, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার হযরত খাদীজা (রা)-কে বিশ্বনারীদের ইতিহাসে মহীয়সী করে রেখেছে।

আমরা হযরত খাদীজা (রা)-এর অনুপম চরিত্র ও মহান ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (র)

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আসল নাম নুমান। তাঁর পিতার নাম সাবিত। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আল্লাহ ভীরু ব্যবসায়ী। হিজরি ৮০ সনে কুফায় তাঁর জন্ম হয়। অসাধারণ মেধা দেখে তাঁর পিতা সন্তানের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনে হাফিয হন। এরপর তাফসীর, হাদীস, আরবি ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তৎকালের জগৎ-বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীদের নিকট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন।

তিনি পবিত্র কুরআন-হাদীস সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জন্য একটি আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, যা ফিক্হ শাস্ত্র নামে পরিচিত। এ শাস্ত্র নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এটা ছিল তাঁর এক মহৎ উদ্যোগ। এ উদ্যোগ সফল করার জন্য বড় বড় আলিমদের নিয়ে তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি দীর্ঘ ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফিক্হ শাস্ত্র সংকলন করেন। এ না হলে সাধারণ মানুষ ইসলামের বিধান পালন করতে অসুবিধায় পড়ত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় পদের মোহ ত্যাগ করেছিলেন। তৎকালীন খলীফা কর্তৃক প্রধান কাযীর লোভনীয় পদও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তিনি ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর আবিদ, আল্লাহ ভীরু। তাঁর চরিত্র ছিল সুন্দর। কথায়, কাজে তিনি মানুষের মন জয় করতে পারতেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। আব্বাসীয় খলীফা মানসুরের জেলখানায় এ মহামনীষী ১৫০ হিজরিতে শাহাদাত বরণ করেন।

আমরা তাঁর সম্বন্ধে আরও জানার চেষ্টা করব। ইমাম আবু হানীফা (র) জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় যে আদর্শ রেখে গেছেন তা আমরা অনুসরণ করব।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) ৪৭০ হিজরি সনে রমযান মাসে ইরানের জিলান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল গাওসুল আযম, মুহিউদ্দিন, কুতুবে রাব্বানী ইত্যাদি। তাঁর পিতার নাম আবু সালেহ মুসা, আর মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা। পিতৃমাতৃ উভয় কূলে তিনি মহানবী (স)-এর বংশধর ছিলেন। শিশুবয়স হতেই তিনি শান্ত, ভদ্র, চিন্তাশীল, শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা। তিনি শিশুবয়সেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। জিলানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন করেন। বাগদাদ গমনকালে তাঁর মাতা তাঁকে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা জামার আস্তিনে সেলাই করে দেন এবং কখনও মিথ্যা না-বলার উপদেশ দেন। বাগদাদ যাওয়ার পথে তাঁর কাফিলা হামাদান নামক স্থানে ডাকাত কবলিত হয়। ডাকাতরা যাত্রীদের সবকিছু লুটে নেয়। ডাকাতরা তাঁর নিকট কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে। লুকানো মুদ্রা দেখে ডাকাতরা বলল, তুমি তো স্বীকার না করলেও পারতে। তিনি বললেন, মা আমাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন, তাই আমি সত্য বলেছি। ডাকাতদল তাঁর সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেল।

বাগদাদে তিনি বিখ্যাত নিয়ামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাগদাদে শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেন। মায়ের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা শেষ হয়ে গেলে তিনি খেয়ে না-খেয়ে, কখনও গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করেন। তবুও লেখাপড়া ত্যাগ করেননি।

শিক্ষা শেষে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বড় বড় আলিম ও শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট জ্ঞান লাভ করতে আসতেন। একদিকে তিনি যেমন শিক্ষকতা করতেন অন্যদিকে তেমনি ওয়ায নসিহত করতেন। তাঁর

ওয়ায মাহফিলে অসংখ্য লোক সমাগত হত। ওয়ায শুনে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতেন আর মুসলমানগণ খাঁটি মুসলমান হতেন। সারাদিন শিক্ষাদান, ওয়ায-নসিহত এবং সারারাত ইবাদাতে কাটাতে। শুব্বার প্রাতে ও সোমবার সন্ধ্যায় তিনি তাঁর মাদ্রাসাতে ওয়ায করতেন, রবিবার প্রাতে করতেন তাঁর খানকায়ে। তিনি অত্যন্ত মানবদরদী ছিলেন। গরিব-দুঃখীদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন, অভাবী দুঃখদের সাহায্য করতেন। বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি তাঁর হাতখরচের অর্থ দ্বারা দুঃখদের সাহায্য করেন এবং নিজে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটান। তিনি অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন। ঝাঁকজমক পছন্দ করতেন না। তাঁর মতো এতবড় ওলী পৃথিবীতে বিরল। তাই তাঁকে গাউসুল আযম বা বড়পীর বলা হয়। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) ৯০ বছর বয়সে ৫৬১ হিজরি সনের ১১ই রবিউস সানি ইন্তিকাল করেন।

আমরা হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ে তুলব। সদা সত্যকথা বলব, শিক্ষা গ্রহণে ত্যাগ স্বীকার করব, দুঃখদের সেবা করব।

হযরত শাহ জালাল (র)

বিশ্ববিখ্যাত ওলী হযরত শাহ জালাল (র) ৫৯৫ হিজরি মোতাবেক ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মাদ। শৈশবে তিনি পিতামাতা হারান। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে লালিতপালিত হন। অল্প বয়সেই তিনি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চস্থান লাভ করেন।

তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। দিল্লি থেকে ৭০৩ হিজরি মোতাবেক ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিলেটে আসেন। সিলেটে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর হাতে এ অঞ্চলের বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত শাহজালাল (র)-এর ব্যাপারে ইতিহাসে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সিলেট অঞ্চলে তখন গৌরগোবিন্দ নামে এক অত্যাচারী হিন্দুরাজা ছিল। সে মুসলমান প্রজাদের অমানুষিক নির্যাতন করত। মুসলমানদের গরু যবেহ করা নিষিদ্ধ ছিল। কেউ গরু যবেহ করলে তার আর রক্ষা ছিল না। সেখানে বুরহানুদ্দীন নামক একজন দীনদার মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রসন্তানের আকীকা উপলক্ষে গোপনে একটি গরু যবেহ করেছিলেন। একটি চিল এক টুকরো গোশত নিয়ে গৌরগোবিন্দের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ফেলেছিল।

গৌরগোবিন্দ গরুর মাংস দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হল এবং গুপ্তচর দ্বারা গরুর যবেহকারী বুরহানুদ্দীনকে ধরিয়ে আনল। শাস্তিস্বরূপ তাঁর হাত কেটে দিল এবং মায়ের কোল থেকে ফুটফুটে শিশুটিকে নিয়ে হত্যা করল। বুরহানুদ্দীন অনেক ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করেও পুত্রের জীবন রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি দিল্লি গমন করে সম্রাট ফিরোজ শাহের নিকট এ অমানুষিক নির্যাতনের বিচার প্রার্থনা করলেন। সব শুনে বাদশাহ সিকান্দার গাজীকে সৈন্যসহ গৌররাজ্য জয়ের জন্য পাঠালেন। কিন্তু গৌরগোবিন্দের নিকট তিন তিনবার পরাজিত হয়ে সৈন্যদল যখন দিল্লি ফিরে যাচ্ছিল, তখন পথে শাহজালাল (র)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। হযরত শাহজালালের অনুপ্রেরণায় তাঁরা গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পুনরায় অগ্রসর হন। গৌরগোবিন্দ এবার অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না। অবশেষে গৌরগোবিন্দ তার লোকজন নিয়ে পালিয়ে গেল।

সিলেট মুসলমানদের হাতে এসে গেল। সিকান্দার শাহকে শাসক বানিয়ে হযরত শাহজালাল (রা) নিজে অনুসারীসহ ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হলেন। তিনি নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদাতে কাটাতে। গরিব-দুঃখীদের তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর ও তাঁর সাথীদের প্রচেষ্টায় বাংলা ও আসাম অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল এবং মুসলমানগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। সমগ্র জীবনই তিনি ইসলামের

খিদমতে ব্যয় করেন। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে অদ্যাবধি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। ৭৪৫ হিজরি মোতাবেক ১৩৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৫০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাযার সিলেটে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত শাহজালাল (র) ছিলেন জগৎ-বিখ্যাত গুলী, মর্দে মুজাহিদ। আমরা তাঁর জীবনচরিত থেকে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য চরম ত্যাগ ও সাধনার আদর্শ গ্রহণ করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। হযরত উমার ফারুক (রা) সর্বদা নবী কারীম (স)-এর সাথে থেকে —

| | |
|------------------------------|------------------------|
| ক. কাব্যচর্চা করতেন | খ. ইসলাম প্রচার করতেন |
| গ. বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতেন | ঘ. কুরআন অধ্যয়ন করতেন |
- ২। হিজরি সন প্রবর্তন করেন —

| | |
|-------------------------|----------------------|
| ক. হযরত উমার ফারুক (রা) | খ. হযরত আবু বকর (রা) |
| গ. হযরত উসমান (রা) | ঘ. হযরত আলী (রা) |
- ৩। খাদীজা (রা) হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্ব দেন। কারণ —

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ক. তাঁর উত্তম চরিত্রের জন্য | খ. তাঁর ব্যবসায়িক দক্ষতার জন্য |
| গ. তাঁর সরলতা ও দায়িত্বরোধের জন্য | ঘ. তিনি বেকার থাকার জন্য |
- ৪। সর্বপ্রথম নবী ছিলেন —

| | |
|-------------------|-----------------------|
| ক. হযরত ইউনুস (আ) | খ. হযরত জাকারিয়া (আ) |
| গ. হযরত নূহ (আ) | ঘ. হযরত আদম (আ) |
- ৫। ফিক্হ শাস্ত্র বলতে বুঝায় —

| | |
|--|---|
| ক. কুরআন ও হাদীসের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ | খ. কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রণীত আইনশাস্ত্র |
| গ. ইসলামের বিধান সংক্রান্ত যেকোনো গ্রন্থ | ঘ. ইসলামের দৃষ্টিতে লিখা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আবদুল করিম সীরাত গ্রন্থ পড়ে জানতে পারে যে, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এ কাজে তাঁরা অনেক ধৈর্য ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। এ অভিজ্ঞতার আলোকে আবদুল করিম তার বন্ধুদেরকে নামায পড়ার দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হয় এবং ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

- ৬। সর্বশেষ নবী —

| | |
|-----------------|-----------------------|
| ক. হযরত নূহ (আ) | খ. হযরত মুহাম্মাদ (স) |
| গ. হযরত আদম (আ) | ঘ. হযরত সালিহ (আ) |

৭। আবদুল করিম দাওয়াতি কাজে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য নিচের কোন্ নবীর দাওয়াতি কাজ থেকে অধিক শিক্ষা নিতে পারে?

ক. হযরত নুত (আ)

খ. হযরত আদম (আ)

গ. হযরত সালিহ (আ)

ঘ. হযরত নূহ (আ)

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। তাঁকে বলা হয় ইসলামের ত্রাণকর্তা। হযরত উমার (রা) ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁকে ফারুক উপাধি প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি রাতের আঁধারে প্রজাদের সুখ-দুঃখ ঘুরে ঘুরে দেখতেন। তিনি ছিলেন আইনের শাসক এবং সাম্য ও মানবতাবোধের এক মহান আদর্শ।

ক. ফারুক অর্থ কী?

খ. হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. একজন রাষ্ট্রনায়ক, হযরত উমার (রা)-এর আদর্শ থেকে কী শিক্ষা লাভ করতে পারে আলোচনা কর।

ঘ. হযরত উমার (রা) অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

২। হযরত নূহ (আ) আল্লাহর একজন নবী। তিনি দীর্ঘকাল মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন। কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশ লোকই ঈমান আনেনি। তাঁরা চরমভাবে তাঁর উপর অত্যাচার করেছিল এবং তাঁর দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল। তবুও তিনি ধৈর্যের সাথে তাঁর দাওয়াতি কাজ চালিয়ে গেছেন। অবশেষে তাঁর দু'আয় আল্লাহ মহাপ্রাণ দেন এবং ঈমানদারগণ ব্যতীত সকলে তাতে ডুবে মারা যায়।

ক. হযরত নূহ (আ) কত বছর মানুষকে আল্লাহর পথে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন?

খ. হযরত নূহ (আ)-এর জাতি কেন মহাপ্রাণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

গ. হযরত নূহ (আ)-এর দাওয়াত ও তাঁর জাতির পরিণতি থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

ঘ. হযরত নূহ (আ)-কে আদমে সানী বা দ্বিতীয় আদম বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩। রাশেদ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তার মহল্লায় চুরি, ছিনতাই, মারামারি, গণ্ডগোল ইত্যাদি ঘটনা অহরহ ঘটছে। এসব সমস্যা দূর করার জন্য মহল্লায় বেশকিছু তরুণ মিলে রাসূল (স)-এর হিলফুল ফুয়ুল সংগঠনের অনুকরণে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। রাশেদ সেই সংগঠনের একজন কর্মী।

ক. হিলফুল ফুয়ুল কী?

খ. রাশেদ ও তরুণরা মিলে কেন সংগঠন গড়ে তুলেছে?

গ. রাশেদ সংগঠনের কর্মী হওয়ার ফলে সে কীভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাচ্ছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের ক্ষেত্রে হিলফুল ফুয়ুল-এর মতো সংগঠনের প্রয়োজন—কথাটি ব্যাখ্যা কর।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. **আকাইদ :** আকাইদ সম্বন্ধীয় পাঠদানে শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে সহজ উদাহরণের সাহায্যে সহজ ও যুক্তিসহ আলোচনা, সুচিন্তিত কার্যক্রম অনুসারে প্রকৃতি পর্যালোচনা, প্রশ্নাবলি আহ্বান ও এগুলো সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাদান করবেন।
২. **ইবাদাত :** নামায ও নামাযের প্রস্তুতিমূলক তাহারাতে হাতে-কলমে শিক্ষাদান, শিক্ষক এগুলো প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করবে। সাওম, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতসমূহেও জায়েয চিত্র ও কাহিনী উল্লেখের মাধ্যমে আলোচনা ও আকর্ষণীয় করবেন।
৩. **আখলাক :** যুক্তিসহ আলোচনা, মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন। প্রশ্নোত্তরে মানবিক দোষগুণের পর্যালোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে ও প্রশ্ন করবে।
৪. **কুরআন শিক্ষা :** কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য মাসক (অনুশীলন), তাজবীদের সাথে কুরআন তিলাওয়াত, সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী উপযুক্ত ও প্রসিদ্ধ ক্বারীর তিলাওয়াত শোনার আয়োজন করবেন; সম্ভব হলে টেপ-রেকর্ড ইত্যাদির ব্যবহার করবেন।
৫. **জীবনচরিত :** বর্ণনাকে সরল করার উদ্দেশ্যে আদর্শ কাহিনীর অবতারণা করে আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন।

মূল্যায়ন

১. বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা, শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও উদাহরণের মাধ্যমে বিভিন্নতা পৃথকীকরণ, বহুবিধ উত্তর থেকে সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা, সঠিক তথ্য দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে হবে।
২. **অর্থ-সামাজিক ও জনসেবামূলক কর্মসূচির** দ্বারা শিক্ষার্থীর মনমানসিকতা, তৎপরতা ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, মসজিদে, ঈদের জামাআতে, মাতাপিতা, ভাইবোন, সহপাঠী ও প্রতিবেশীদের সাথে আচার-ব্যবহারে, সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আন্তরিকতার সাথে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিতে হবে।
৩. প্রচলিত পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতিকে পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ ও তার দৈনন্দিন, মাসিক এবং বার্ষিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

- ক. ইসলাম-শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা।
- খ. ইসলামের বিষয়বস্তু অনুধাবনের পরিধি যাচাই করা।
- গ. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ের মৌলিক দিকগুলো আয়ত্তকরণ পর্যালোচনা করা।
- ঘ. প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়ের ওপর সম্ভব হলে সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা যাচাই করা।

- ঙ. ইবাদাত করার প্রবণতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।
- চ. নিজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলাম-শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ও রেকর্ড মূল্যায়ন করা।
- ছ. মসজিদ, নামায-ঘর, মক্তব, লাইব্রেরি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও দায়িত্ব পালনের রেকর্ড মূল্যায়ন করা।
- জ. কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও ইসলামী বই এবং পত্র-পত্রিকা পাঠের সম্মুখে ধারণা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।
- ঝ. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ইসলামী বিধানের প্রয়োগ ও গুরুত্ব সম্পর্কে অর্জিত ধারণা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।

নিচে কয়েকটি ব্যবহারিক কাজের নাম উল্লেখ করা হল।

১. ইমানের ৭টি মূল বিষয়ের নাম লেখা।
২. ১০ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা।
৩. আখিরাতের পর্যায়গুলো বর্ণনা করা।
৪. পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো ১টি রুকু নাযিরা পাঠ করা।
৫. পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো ১টি সূরা মুখস্থ বলা।
৬. শরীআতের পরিভাষাগুলোর নামের তালিকা প্রস্তুত করা।
৭. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও রাকআত সংখ্যার তালিকা তৈরি করা।
৮. সঠিক পদ্ধতিতে ওয়ু করতে পারা।
৯. সঠিকভাবে ২, ৩, ও ৪ রাকআত বিশিষ্ট নামায আদায় করতে পারা।
১০. নামাযে ব্যবহৃত দুআ কালাম মুখস্থ বলতে পারা।
১১. নামাযে ব্যবহৃত দুআ কালামের অর্থ ও মর্ম বলতে পারা।
১২. কোন্ কোন্ জিনিসের যাকাত দিতে হয় তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা।
১৩. আমরা কীভাবে পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ করতে পারি-তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা।
১৪. আত্মীয়-স্বজনের একটি তালিকা প্রণয়ন করা।
১৫. প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের করণীয় কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করা।
১৬. অসহায়-দরিদ্রদের যে যে উপায়ে সাহায্য করা যায় তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা।
১৭. সদাচরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা।
১৮. আমরা কী কী উপায়ে দেশের সেবা করতে পারি, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা।
১৯. হালাল উপার্জনের উপায়ের একটি তালিকা প্রণয়ন করা।
২০. কী কী গুণ দেখে বন্দু নির্বাচন করতে হবে, এর একটি তালিকা তৈরি করা।

